ব্যোমকেশ ও বরদা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

০১. ভূতান্বেষী বরদাবাবু 2

০২. প্রাথমিক নমস্কারাদি 15

০৩. অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন 27

০৪. কেল্লায় প্রবেশ করিয়া 40

০৪. কৈলাসবাবু মুখ বাড়াইয়া আছেন 51

০৬. দুপুরবেলাটা ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল 61

০৭. ব্যোমকেশ সম্বন্ধে হতাশ 76

০৮. সতেরো মিনিট রয়েছে মাত্র 87

০১. ভূতান্বেষী বরদাবাবু

বেশি দিনের কথা নয়, ভূতান্বেষী বরদাবাবুর সহিত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের একবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মনটা স্বভাবত বহির্বিমুখ, ঘরের কোণে মাকড়সার মত জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেই সে ভালবাসে। কিন্তু সেবার সে পাক্কা তিনশ' মাইলের পাড়ি জমাইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল।

ব্যোমকেশের এক বাল্যবন্ধু বেহার প্রদেশে ডি.এসপি'র কাজ করিতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মুঙ্গেরে বদলি হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণের অন্তরালে বোধ হয় কোনো গরজ প্রচ্ছন্ন ছিল; নচেৎ পুলিসের ডি.এস.পি. বিনা প্রয়োজনে পুরাতন অর্ধবিস্মৃত বন্ধুত্ব ঝালাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন। ইহা কল্পনা করিতেও মনটা নারাজ হইয়া উঠে।

ভাদ্র মাসের শেষাশেষি; আকাশের মেঘগুলা অপব্যয়ের প্রাচুর্যে ফ্যাকাসে হইয়া আসিয়াছে , এমন সময় একদিন ব্যোমকেশ পুলিস-বন্ধুর পত্র পাইয়া এক রকম মরিয়া হইয়াই বলিয়া উঠিল, 'চল, মুঙ্গের ঘুরে আসা যাক।'

আমি পা বাড়াইয়াই ছিলাম। পূজার প্রাক্কালে শরতের বাতাসে এমন একটা কিছু আছে যাহা ঘরবাসী বাঙালীকে পশ্চিমের দিকে ও প্রবাসী বাঙালীকে ঘরের দিকে নিরন্তর ঠেলিতে থাকে। সানন্দে বলিলাম, 'চল।'

যথাসময়ে মুঙ্গের স্টেশনে উতরিয়া দেখিলাম ডি.এস.পি. সাহেব উপস্থিত আছেন। ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্কবাবু; আমাদেরই সমবয়স্ক হইবেন, ত্রিশের কোঠা এখনো পার হয় নাই; তবু ইহারি মধ্যে মুখে ও চালচলনে একটা বয়স্থ ভারিক্কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অধিক দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহাকে প্রবীণ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া কেল্লার মধ্যে তাঁহার সরকারী কোয়াটারে আনিয়া তুলিলেন।

মুঙ্গের শহরে 'কেল্লা' নামে যে স্থানটা পরিচিত তাহার কেল্লাত্ব এখন আর কিছু নাই; তবে এককালে উহা মীরকাশিমের দুর্ধর্ষ দুর্গ ছিল বটে। প্রায় সিকি মাইল পরিমিত বৃত্তাকৃতি স্থান প্রাকার ও গড়খাই দিয়া ঘেরা-পশ্চিম দিকে গঙ্গা। বাহিরে যাইবার তিনটি মাত্র তোরণদ্বার আছে। বর্তমানে এই কেল্লার মধ্যে আদালত ও সরকারী উচ্চ কর্মচারীদের বাসস্থান, জেলখানা, বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ছাড়া সাধারণ ভদ্রলোকের বাসগৃহও দুচারিটি আছে। শহর বাজার ও প্রকৃত লোকালয় ইহার বাহিরে; কেল্লাটা যেন রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য একটু স্বতন্ত্র অভিজাত পল্লী।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া চা ও প্রাতরাশের সহযোগে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমাদের আদর অভ্যর্থনা খুবই করিলেন; কিন্তু দেখিলাম লোকটি ভারি চতুর, কথাবাতায় অতিশয় পটু। নানা অবাস্তর আলোচনার ভিতর দিয়া পুরাতন বন্ধুত্বের স্মৃতির উল্লেখ করিতে করিতে মুঙ্গেরে কি কি দর্শনীয় জিনিস আছে তাহার ফিরিস্তি দিতে দিতে কখন যে অজ্ঞাতসারে তাঁহার মূল বক্তব্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে ঠাহর করা যায় না। অত্যন্ত কাজের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই, বাক্যের মুন্সিয়ানার দ্বারা

কাজের কথাটি এমনভাবে উত্থাপন করিতে পারেন যে কাহারো ক্ষোভ বা অসন্তোষের কারণ থাকে না।

বস্তুত আমরা তাঁহার বাসায় পৌঁছিবার আধঘণ্টার মধ্যে তিনি যে কাজের কথাটা পাড়িয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমি প্রথমটা ধরিতেই পারি নাই; কিন্তু ব্যোমকেশের চোখে কৌতুকের একটু আভাস দেখিয়া সচেতন হইয়া উঠিলাম। শশাঙ্কবাবু তখন বলিতেছিলেন, 'শুধু ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ বা গরম জলের প্রস্রবণ দেখিয়েই তোমাদের নিরাশ করব না, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার যদি দেখতে চাও দেখাতে পারি। সম্প্রতি শহরে একটি রহস্যময় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁকে নিয়ে কিছু বিব্রত আছি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভূতের পেছন বিরত থাকাও কি তোমাদের একটা কর্তব্য নাকি?'

শশাঙ্কবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আরে না না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে–। হয়েছে কি, মাস ছয়েক আগে এই কেল্লার মধ্যেই একটি ভদ্রলোকের ভারী রহস্যময়ভাবে মৃত্যু হয়। এখনো সে-মৃত্যুর কিনারা হয়নি, কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর প্রেতাত্মা তাঁর পুরনো বাড়িতে হানা দিতে আরম্ভ করেছে।'

ব্যোমকেশ শূন্য চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিল; দেখিলাম তাহার চোখের ভিতর গভীর কৌতুক ক্রীড়া করিতেছে। সে সযত্নে রুমাল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর একটি সিগারেট ধরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'শশাঙ্ক, তোমার কথা বলবার ভঙ্গীটি আগেকার মতই

চমৎকার আছে দেখছি, এবং সদ্য-ব্যবহারে আরো পরিমার্জিত হয়েছে। এখনো এক ঘণ্টা হয়নি মুঙ্গেরে পা দিয়েছি, কিন্তু এরি মধ্যে তোমার কথা শুনে স্থানীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। —ঘটনাটা কি, খুলে বল।’

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শশাঙ্কবাবু ব্যোমকেশের ইঙ্গিতটা বুঝিলেন এবং বোধ করি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া কিছুই ধরা গেল না। সহজভাবে বলিলেন, ‘আর এক পেয়ালা চা? নেবে না? পান নাও। নিন। অজিতবাবু। আচ্ছা—ঘটনাটা বলি তাহলে; যদিও এমন কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়। ছ’মাস আগেকার ঘটনা–

শশাঙ্কবাবু জর্দা ও পান মুখে দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

‘এই কেল্লার মধ্যেই দক্ষিণ ফটকের দিকে একটি বাড়ি আছে। বাড়িটি ছোট হলেও দোতলা, চারিদিকে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। কেল্লার মধ্যে সব বাড়িই বেশ ফাঁকা—শহরের মত ঘেঁষাঘেষি ঠাসাঠাসি নেই; প্রত্যেক বাড়িরই কম্পাউন্ড আছে। এই বাড়িটির মালিক স্থানীয় একজন ‘রইস-তিনি বাড়িটি ভাড়া দিয়ে থাকেন।

‘গত পনেরো বছর ধরে এই বাড়িতে যিনি বাস করছিলেন তাঁর নাম—-বৈকুণ্ঠ দাস। লোকটির বয়স হয়েছিল—জাতিতে স্বর্ণকার। বাজারে একটি সোনারূপার দোকান ছিল; কিন্তু দোকানটা নামমাত্র। তাঁর আসল কারবার ছিল জহরতের। হিসাবের খাতপত্র থেকে

দেখা যায়, মৃত্যুকালে তাঁর কাছে একান্নখানা হীরা মুক্ত চুনি পান্না ছিল—যার দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

‘এই সব দামী মণি-মুক্ত তিনি বাড়িতেই রাখতেন-দোকানে রাখতেন না। অথচ আশ্চর্য এই যে তাঁর বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না। কোথায় তিনি তাঁর মূল্যবান মণি-মুক্তা রাখতেন কেউ জানে না। খরিদার এলে তাকে তিনি বাড়িতে নিয়ে আসতেন, তারপর খরিদারকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে ওপরে গিয়ে শোবার ঘর থেকে প্রয়োজন মত জিনিস এনে দেখাতেন।

‘হীরা জহরতের বহর দেখেই বুঝতে পারছ লোকটি বড় মানুষ। কিন্তু তাঁর চাল-চলন দেখে কেউ তা সন্দেহ করতে পারত না। নিতান্ত নিরীহ গোছের আধাবয়সী লোক, দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তি, গলায় তুলসীকণ্ঠি-সর্বদাই জোড়হস্ত হয়ে থাকতেন। কিন্তু কোন সৎকার্যের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে এত বেশি বিমর্ষ এবং কাতর হয়ে পড়তেন যে শহরের ছেলেরা তাঁর কাছে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা ছেড়েই দিয়েছিল। তাঁর নামটাও এই সূত্রে একটু বিকৃত হয়ে পরিহাসচ্ছলে ‘ব্যয়-কুণ্ঠ’ আকার ধারণ করেছিল। শহরলুব্ধ বাঙালী তাঁকে ব্যয়-কুণ্ঠ জহুরী বলেই উল্লেখ করত।

‘বাস্তবিক লোকটি অসাধারণ কৃপণ ছিলেন। মাসে সত্তর টাকা তাঁর খরচ ছিল, তার মধ্যে চল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া; বাকি ত্রিশ টাকায় নিজের, একটি মেয়ের আর এক হাবাকালা চাকরের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে নিতেন; আমি তাঁর দৈনন্দিন খরচের খাতা দেখেছি, কখনও সত্তরের কোঠা পেরোয়নি। আশ্চর্য নয়?—আমি ভাবি, লোকটি যখন এতবড় কৃপণই

ছিলেন তখন এত বেশি। ভাড়া দিয়ে কেল্লার মধ্যে থাকবার কারণ কি? কেল্লার বাইরে থাকলে তো ঢের কম ভাড়ায় থাকতে পারতেন।’

ব্যোমকেশ ডেক-চেয়ারে লম্বা হইয়া অদূরের পাষাণ-নির্মিত দুর্গ-তোরণের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিল; বলিল, ‘কেল্লার ভিতরটা বাইরের চাইতে নিশ্চয় বেশি নিরাপদ্, চোর-বদমাসের আনাগোনা কম। সুতরাং যার কাছে আড়াই লক্ষ টাকার জহরত আছে সে তো নিরাপদ স্থান দেখেই বাড়ি নেবে। বৈকুণ্ঠবাবু ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন বটে। কিন্তু অসাবধানী লোক বোধ হয় ছিলেন না।’

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, ‘আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। কিন্তু কেল্লার মধ্যে থেকেও বৈকুণ্ঠবাবু যে চোরের শেনদৃষ্টি এড়াতে পারেননি। সেই গল্পই বলছি। সম্ভবত তাঁর বাড়িতে চুরি করবার সঙ্কল্প অনেকদিন থেকেই চলছিল। মুঙ্গের জায়গাটি ছোট বটে, তাই বলে তাকে তুচ্ছ মনে কোরো না।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘না না, সে কি কথা!’

‘এখানে এমন দু’ চারটি মহাপুরুষ আছেন যাঁদের সমকক্ষ চৌকশ চোর দাগাবাজ খুনে তোমাদের কলকাতাতেও পাবে না। বলব কি তোমাকে, গভর্নমেন্টকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে হে। এখানে মীরকাশিমের আমলের অনেক দিশী বন্দুকের কারখানা আছে জান তো? কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে, আগে বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্পটাই বলি।’

এইভাবে সামান্য অবাস্তর কথার ভিতর দিয়া শশাঙ্কবাবু পুলিসের তথা নিজের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বের একটা গূঢ় ইঙ্গিত দিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন–

'গত ছাব্বিশে এপ্রিল-অর্থাৎ বাংলার ১২ই বৈশাখ-বৈকুণ্ঠবাবু আটটার সময় তাঁর দোকান থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। নিতান্তই সহজ মানুষ, মনে আসন্ন দুর্ঘটনার পূবাভাস পর্যন্ত নেই। আহারাদি করে রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় তিনি দোতলার ঘরে শুতে গেলেন। তাঁর মেয়ে নীচের তলায় ঠাকুরঘরে শুতো, সেও বোপকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলে। হাবাকাল চাকরিটা রাত্রে দোকান পাহারা দিত, মালিক বাড়ি ফেরবার পরই সে চলে গেল। তারপর বাড়িতে কি ঘটেছে, কেউ কিছু জানে না।

'সকালবেলা যখন দেখা গেল যে বৈকুণ্ঠবাবুঘরের দোর খুলছেন না, তখন দোর ভেঙে ফেলা হল। পুলিস ঘরে ঢুকে দেখলে বৈকুণ্ঠবাবুর মৃতদেহ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোথাও তাঁর গায়ে আঘাত-চিহ্ন নেই, আততায়ী গলা টিপে তাঁকে মেরেছে; তারপর তাঁর সমস্ত জহরত নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে প্রস্থান করেছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আততায়ী তাহলে জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'তই তো মনে হয়। ঘরের একটি মাত্র দরজা বন্ধ ছিল, সুতরাং জানলা ছাড়া ঢোকবার আর পথ কোথায়! আমার বিশ্বাস, বৈকুণ্ঠবাবু রাত্রে জানলা খুলে শুয়েছিলেন; গ্রীষ্মকাল-সে–রাত্রিটা গরমও ছিল খুব। জানলার গরাদ নেই, কাজেই মই লাগিয়ে চোরেরা সহজেই ঘরে ঢুকতে পেরেছিল।'

'বৈকুণ্ঠবাবুর হীরা জহরত সবই চুরি গিয়েছিল?'

'সমস্ত। আড়াই লক্ষ টাকার জহরত একেবারে লোপাট। একটিও পাওয়া যায়নি। এমন কি তাঁর কাঠের হাত-বাক্সে যে টাকা-পয়সা ছিল তাও চোরের ফেলে যায়নি-সমস্ত নিয়ে গিয়েছিল।'

'কাঠের হাত-বাক্সে বৈকুণ্ঠবাবু হীরা জহরত রাখতেন?'

'তাছাড়া রাখবার জায়গা কৈ? অবশ্য হাত-বাক্সেই যে রাখতেন তার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর শোবার ঘরে কারু ঢোকবারই হুকুম ছিল না, মেয়ে পর্যন্ত জানত না তিনি কোথায় কি রাখেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না; অথচ হীরা মুক্তা যা-কিছু সব শোবার ঘরেই রাখতেন। সুতরাং হাত-বাক্সেই সেগুলো থাকত, ধরে নিতে হবে।'.

'ঘরে আর কোনো বাক্স-প্যাঁটুরা বা ঐ ধরনের কিছু ছিল না?

'কিছু না। শুনলে আশ্চর্য হবে, ঘরে একটা মাদুর, একটা বালিশ, ঐ হাত-বাক্সটা, পানের বাটা আর জলের কলসী ছাড়া কিছু ছিল না। দেয়ালে একটা ছবি পর্যন্ত না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পানের বাটা! সেটা ভাল করে দেখেছিলে তো?'

শশাঙ্কবাবু ক্ষুব্ধভাবে ঈষৎ হাসিলেন—'ওহে, তোমরা আমাদের যতটা গাধা মনে কর, সত্যিই আমরা ততটা গাধা নাই। ঘরের সব জিনিসই অতিপতি করে তল্লাস করা হয়েছিল। পানের বাটার মধ্যে ছিল একদলা চুন, খানিকটা করে খয়ের সুপুরি লবঙ্গ—আর পানের পাতা। বাটাটা পিতলের তৈরি, তাতে চুন খয়ের সুপুরির জন্য আলাদা খুবরি কাটা ছিল। বৈকুণ্ঠবাবু খুব বেশি পান খেতেন, অন্যের সাজা পান পছন্দ হত না বলে নিজে সেজে খেতেন।–আর কিছু জানতে চাও এ সম্বন্ধে?'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না না, ওই যথেষ্ট। তোমাদের ধৈর্য আর অধ্যবসায় সম্বন্ধে তো কোনো প্রশ্ন নেই; সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। সেই সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি-কিন্তু সে যাক। মোট কথা দাঁড়াল এই যে বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে তাঁর আড়াই লক্ষ টাকার জহরত নিয়ে চোর কিম্বা চোরেরা চম্পট দিয়েছে। তারপর ছমাস কেটে গেছে। কিন্তু তোমরা কোনো কিনারা করতে পারোনি। জহরতগুলো বাজারে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে কি না-সে খবর পেয়েছ?'

'এখনো জহরত বাজারে আসেনি। এলে আমরা খবর পেতুম। চারিদিকে গোয়েন্দা আছে।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর আর কি–ঐ পর্যন্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তিনি নগদ টাকা কিছুই রেখে যেতে পারেননি; কোথাও একটি পয়সা পর্যন্ত ছিল না। দোকানের সোনা-রূপা বিক্রি করে যা সামান্য কিছু টাকা পেয়েছে সেইটুকুই সম্বল। বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ে, বিদেশে পয়সার অভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে রয়েছে দেখলেও কষ্ট হয়।'

'কার গলগ্রহ হয়ে আছে?'

'স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিল–নাম তারাশঙ্করবাবু। তিনিই নিজের বাড়িতে রেখেছেন। লোকটি উকিল হলেও ভাল বলতে হবে। বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে প্রণয়ও ছিল, প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা দু'জনে দাবা খেলতেন—'

'হুঁ। মেয়েটি বিধবা?

'না, সধবা। তবে বিধবা বললেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীটা অল্প বয়সে বয়াটে হয়ে যায়। মাতাল দুশ্চরিত্র–থিয়েটার যাত্রা করে বেড়াত, তারপর হঠাৎ নাকি এক সার্কাস পাটির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। সেই থেকে নিরুদ্দেশ। তাই মেয়েকে বৈকুণ্ঠবাবু নিজের কাছেই রেখেছিলেন।'

'মেয়েটির বয়স কত?

তেইশ-চব্বিশ হবে।’

চরিত্র কেমন?’।

‘যতদূর জানি, ভাল। চেহারাও ভাল থাকার অনুকুল–অর্থাৎ জলার পেত্নী বললেই হয়। স্বামী বেচারাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না–’

‘বুঝেছি। দেশে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?’

‘না-থাকারই মধ্যে। নবদ্বীপে খুড়তুতো ভায়েরা আছে, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কয়েকজন ছুটে এসেছিল। কিন্তু যখন দেখলে এক ফোঁটাও রস নেই, সব চোরে নিয়ে গেছে, তখন যে-যার খসে পড়ল।’

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি অভিনবত্ব রয়েছে। কিন্তু এত বেশি দেরি হয়ে গেছে যে আর কিছু করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমি বিদেশী, দুদিনের জন্য এসেছি, তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তুমিও বোধ হয় তা পছন্দ করবে না।’

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, ‘না না, হস্তক্ষেপ করতে যাবে কেন? আমি অফিসিয়ালি তোমাকে কিছু বলছি না; তবে তুমিও এই কাজের কাজী, যদি দেখে শুনে তোমার মনে কোনো

আইডিয়া আসে তাহলে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে পার। তুমি বেড়াতে এসেছ, তোমার ওপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে আমি চাই না।'

শশাঙ্কবাবুর মনের ভাবটা অজ্ঞাত রহিল না। সাহায্য লইতে তিনি পুরাদস্তুর রাজী, কিন্তু 'অফিসিয়ালি কাহারো কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া যশের ভাগ দিতে নারাজ।

ব্যোমকেশও হাসিল, বলিল, 'বেশ, তাই হবে। দায়িত্ব না নিয়েই তোমাকে সাহায্য করব।–ভাল কথা, ভূতের উপদ্রবের কথা কি বলছিলে?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার কিছুদিন পরেই ঐ বাড়িতে আর একজন বাঙালী ভাড়াটে এসেছেন, তিনি আসার পর থেকেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। সব কথা অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু যে সব ব্যাপার ঘটছে তাতে রোমাঞ্চ হয়। পনেরো হাত লম্বা। একটি প্রেতাত্মা রাত্রে ঘরের জানোলা দিয়ে উঁকি মারে। বাড়ির লোক ছাড়াও আরো কেউ কেউ দেখেছে।'

'বল কি?'

'হ্যাঁ।–এখানে বরদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন-আরো! নাম করতে না করতেই এসে পড়েছেন যে! অনেকদিন বাঁচবেন। শৈলেনবাবুও আছেন।–বেশ বেশ। আসুন। ব্যোমকেশ, বরদাবাবু হচ্ছেন্ন ভূতের একজন বিশেষজ্ঞ। ভুতুড়ে ব্যাপার ওঁর মুখেই শোনো।'

০২. প্রাথমিক নমস্কারাদি

প্রাথমিক নমস্কারাদির পর নবাগত দুইজন আসন গ্রহণ করিলেন। বরদাবাবুর চেহারাটি গোলগাল বেঁটে-খাটো, রং ফরসা, দাড়ি গোঁফ কামানো; সব মিলাইয়া নৈনিতাল আলুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার সঙ্গী শৈলেনবাবুইহার বিপরীত; লম্বা একহারা গঠন, অথচ ক্ষীণ বলা চলে না। কথায় বাতায় উভয়ের পরিচয় জানিতে পারিলাম। বরদাবাবু এখানকার বাসিন্দা, পৈতৃক কিছু জমিজমা ও কয়েকখানা বাড়ির উপস্বত্ব ভোগ করেন এবং অবসরকালে প্রেততত্ত্বের চচা করিয়া থাকেন। শৈলেনবাবু ধনী ব্যক্তি-স্বাস্থ্যের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানটি তাঁহার স্বাস্থ্যের সহিত এমন খাপ খাইয়া গিয়াছে যে বাড়ি কিনিয়া এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বয়স উভয়েরই চল্লিশের নীচে।

আমাদের পরিচয়ও তাঁহাদিগকে দিলাম-কিন্তু দেখা গেল ব্যোমকেশের নাম পর্যন্ত তাঁহারা শোনেন নাই। খ্যাতি এমনই জিনিস!

যা হোক, পরিচয় আদান-প্রদানের পর বরদাবাবু বলিলেন, ‘ব্যয়কুণ্ঠ জহুরীর গল্প শুনছিলেন বুঝি? বড়ই শোচনীয় ব্যাপার-অপঘাত মৃত্যু। আমার বিশ্বাস গয়ায় পিণ্ড না দিলে তাঁর আত্মার সদগতি হবে না।’

ব্যোমকেশ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, ‘আপনি প্রেতিযোনি বিশ্বাস করেন না?’

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘অবিশ্বাসও করি না। প্রেতিযোনি আমার হিসেবের বাইরে।’ বরদাবাবু বলিলেন, ‘আপনি হিসেবের বাইরে রাখতে চাইলেও তারা যে থাকতে চায় না। ঐখানেই তো মুশকিল। শৈলেনবাবু, আপনিও তো আগে ভূত বিশ্বাস করতেন না, বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখন?

বরদাবাবুর সঙ্গী বলিলেন, ‘এখন গোঁড়া ভক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক ব্যোমকেশবাবু, আগে আমিও আপনার মত ছিলুম, ভূত-প্রেত নিয়ে মাথা ঘামাতুম না। কিন্তু এখানে এসে বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর যতই এ বিষয়ে আলোচনা করছি ততই আমার ধারণা হচ্ছে যে ভুতকে বাদ দিয়ে এ সংসারে চলা এরকম অসম্ভব।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘কি জানি! আমাদের তো এখন পর্যন্ত বেশ চলে যাচ্ছে। আর দেখুন, এমনিতেই মানুষের জীবনযাত্রাটা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে তার ওপর আবার–’

শশাঙ্কবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, ‘ও সব যাক। বরদাবাবু, আপনি ব্যোমকেশকে বৈকুণ্ঠবাবুর ভূতুড়ে কাহিনীটা শুনিয়ে দিন।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘হ্যাঁ, সেই ভাল। তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে গল্প শোনা ঢের বেশি। আরামের।’

বরদাবাবুর মুখে তৃপ্তির একটা ঝিলিক খেলিয়া গেল। জগতে গল্প বলিবার লোক অনেক আছে-কিন্তু অনুরাগী শ্রোতা সকলের ভাগ্যে জোটে না। অধিকাংশই অবিশ্বাসী ও ছিদ্রান্বেষী্, গল্প শোনার চেয়ে তর্ক করিতেই অধিক ভালবাসে। তাই ব্যোমকেশ যখন তত্ত্ব ছাড়িয়া গল্প শুনিতেই সম্মত হইল। তখন বরদাবাবু যেন অপ্রত্যাশিতের আবিভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম, শিষ্ট এবং ধৈর্যবান শ্রোতা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

শশাঙ্কবাবুর কোটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্বক বরদাবাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের গল্প বলিবার ভঙ্গী এক নয়; বরদাবাবুর ভঙ্গীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি নাই-ধীরমন্থর তালে চলিয়াছে; ঘটনার বাহুল্যে গল্প কণ্টকিত নয়, অথচ এরূপ নিপুণভাবে ঘটনাগুলি বিন্যস্ত যে শ্রোতার মনকে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলে। চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভঙ্গিমা এমনভাবে গল্পের সহিত সঙ্গত করিয়া চলে যে সব মিশাইয়া একটি অখণ্ড রস বস্তুর আস্বাদ পাইতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর কথা আপনারা শুনেছেন। অপঘাত মৃত্যু; পরলোকের জন্য প্রস্তুত হবার অবকাশ তিনি পাননি। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, মানুষের আত্মা সহসা অতর্কিতভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার দেহাভিমান দূর হয় না-অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না। তার দেহ নেই। আবার কখনো কখনো বুঝতে পারলেও সংসারের মোহ ভুলতে পারে না, ঘুরে ফিবে তার জীবিতকালের কর্মক্ষেত্রে আনাগোনা করতে থাকে।

'এসব থিয়োরি আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু যে অলৌকিক কাহিনী আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি-এ ছাড়া তার আর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঘটনা যে সত্য সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আমি আষাঢ়ে গল্প বলি এই রকম একটা অপবাদ আছে; কিন্তু এক্ষেত্রে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে আমি একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। কি বলেন। শৈলেনবাবু?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। অমূল্যবাবুকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে ঘটনা মিথ্যে নয়।' বরদাবাবু বলিতে লাগিলেন, 'সুতরাং কারণ যাই হোক, ঘটনোটা নিঃসংশয়। বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর কয়েক হপ্তা তাঁর বাড়িখানা পুলিসের কবলে রইল; ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে তারাশঙ্করবাবু নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। এ কয়দিনের মধ্যে কিছু ঘটেছিল কি না বলতে পারি না, পলিসের যে দু'জন কনস্টেবল সেখানে পাহারা দেবার জন্য মোতা যেন হয়েছিল তারা সম্ভবত সন্ধের পর দু' ঘটি ভাঙি চড়িয়ে এমন নিদ্রা দিত যে ভূত-প্রেতের মত অশরীরী জীবের গতিবিধি লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তাদের থাকত না। যা হোক, পুলিস সেখান থেকে থানা তুলে নেবার পরই একজন নবাগত ভাড়াটে বাড়িতে এলেন। ভদ্রলোকের নাম কৈলাসচন্দ্র মল্লিক-রোগজীর্ণ বৃদ্ধ-স্বাস্থ্যের অন্বেষণে মুঙ্গেরে এসে কেল্লায় একখানা বাড়ি খালি হয়েছে দেখে খোঁজখবর না নিয়েই বাড়ি দখল করে বসলেন-বাড়ির মালিকও খুনের ইতিহাস তাঁকে জানাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না।

'কয়েকদিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। দোতলায় একটি মাত্র শোবার ঘর-যে-ঘরে বৈকুণ্ঠবাবু মারা গিয়েছিলেন-সেই ঘরটিতেই কৈলাসবাবু শুতে লাগলেন। নীচের তলায় তাঁর চাকর বামুন সরকার রইল। কৈলাসবাবুর অবস্থা বেশ ভাল, পাড়া গেয়ে জমিদার। একমাত্র ছেলের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, স্ত্রীও জীবিত নেই-তই কেবল চাকর বামুনের ওপর নির্ভর করেই হাওয়া বদলাতে এসেছেন।

'ছয় সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন ভূতের আবির্ভাব হল। রাত্রি নোটার সময় ওষুধ খেয়ে তিনি নিদ্রার আয়োজন করছেন, এমন সময় নজর পড়ল জানালার দিকে। গ্রীষ্মকাল, জানালা খোলাই ছিল—দেখলেন, কদাকার একখানা মুখ ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে। কৈলাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন, চাকর-বাকর নীচে থেকে ছুটে এল। কিন্তু মুখখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'তারপর আরো দুই রাত্রি ওই ব্যাপার হল। প্রথম রাত্রির ব্যাপারটা রুগ্ন কৈলাসবাবুর মানসিক ভ্রান্তি বলে সকলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হল না। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে তখনো কৈলাসবাবুর আলাপ হয়নি, কিন্তু আমরাও জানতে পারলুম।

"ভূত-প্রেত সম্বন্ধে আমার একটা বৈজ্ঞানিক কৌতুহল আছে। নেই বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না, আবার চোখ বুজে তাকে মেনে নিতেও পারি না। তাই, অন্য সকলে যখন ঘটনাটাকে পরিহাসের একটি সরস উপাদান মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, আমি

তখন ভাবলুম—দেখিই না; অপ্রাকৃত বিষয় বলে মিথ্যেই হতে হবে এমন কি মানে আছে?

‘একদিন আমি এবং আরো কয়েকজন বন্ধু কৈলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি রোগে পঙ্গু-হার্টের ব্যারাম-নীচে নাম ডাক্তারের নিষেধ; তাঁর শোবার ঘরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। খিটখিটে স্বভাবের লোক হলেও তাঁর বাহ্য আদব-কায়দা বেশ দুরস্ত্‍, আমাদের ভালভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর কাছ থেকে ভৌতিক ব্যাপারের সঠিক ব্বিরণ পাওয়া গেল।

‘তিনি বললেন-গতি পনেরো দিনের মধ্যে চারবার প্রেতিমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। চারবারই সে জানালার সামনে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে—তারপর মিলিয়ে গেছে। তার আসার সময়ের কিছু ঠিক নেই; কখনো দুপুর রাত্রে এসেছে, কখনো শেষ রাত্রে এসেছে, আবার কখনো বা সন্ধের সময়েও দেখা দিয়েছে। মূর্তিটা সুশ্রী নয়, চোখে একটা লুব্ধ ক্ষুধিত ভাব। যেন ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু মানুষ আছে দেখে সাক্ষাতে ফিরে চলে যাচ্ছে।

‘কৈলাসবাবুর গল্প শুনে আমরা স্থির করলুম, স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে। কৈলাসবাবুও আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। পরদিন থেকে আমরা প্রত্যহ তাঁর বাড়িতে পাহারা আরম্ভ করলুম। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি দশটা-কখনো বা এগারোটা বেজে যায়। কিন্তু প্রেতিয়োনির দেখা নেই। যদি বা কদাচিৎ আসে, আমরা চলে যাবার পর আসে; আমরা দেখতে পাই না।

'দিন দশেক আনাগোনা করবার পর আমার বন্ধুরা একে একে খসে পড়তে লাগলেন; শৈলেনবাবুও ভগ্নোদ্যম হয়ে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। আমি কেবল একলা লেগে রইলুম। সন্ধ্যের পর যাই; কৈলাসবাবুর সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করি, তারপর সাড়ে-দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।

'এইভাবে আরো এক হপ্তা কেটে গেল। আমিও ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়তে লাগলুম। এ কি রকম প্রেতাত্মা যে কৈলাসবাবু ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। কৈলাসবাবুর ওপর নানা রকম সন্দেহ হতে লাগিল।

'তারপর একদিন হঠাৎ আমার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেলুম। কৈলাসবাবুর ওপরে সন্দেহও ঘুচে গেল।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ একমনে শুনিতেছিল, বলিল, 'আপনি দেখলেন?' গভীর স্বরে বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ-আমি দেখলুম।' ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল।।–'তই তো!' তারপর কিয়াৎকাল যেন চিন্তা করিয়া বলিল, 'বৈকুণ্ঠবাবুকে চিনতে পারলেন?'

বরদাবাবু মাথা নাড়িলেন–'তা ঠিক বলতে পারি না। —একখানা মুখ, খুব স্পষ্ট নয়। তবু মানুষের মত তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহুর্তের জন্যে আবছায়া ছবির মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি আশ্চর্য! প্রত্যক্ষভাবে ভুত দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না; অধিকাংশ স্থলেই ভৌতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়-হয় শোনা কথা, নয় তো রজ্জুতে সর্পভ্রম।'

ব্যোমকেশের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তাহা বোধ করি শৈলেনবাবুকে বিদ্ধ করিল; তিনি বলিলেন, 'শুধু বরদাবাবু নয়, তারপর আরো অনেকে দেখেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিও দেখেছেন নাকি?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। হয়তো বরদাবাবুর মত অত স্পষ্টভাবে দেখিনি, তবু দেখেছি। বরদাবাবু দেখবার পর আমরা কয়েকজন আবার যেতে আরম্ভ করেছিলুম। একদিন আমি নিমেষের জন্য দেখে ফেললুম।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'সেদিন শৈলেনবাবু উত্তেজিত হয়ে একটু ভুল করে ফেলেছিলেন বলেই ভাল করে দেখতে পাননি। আমরা কয়েকজন-আমি, অমূল্য আর ডাক্তার শচী রায়-কৈলাসবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলুম; তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিতে দিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু শৈলেনবাবু শিকারীর মত জানালার দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ উনি 'ঐ ঐ—' করে চেচিয়ে উঠলেন। আমরা ধড়মড় করে ফিরে চাইলুম, কিন্তু তখন আর কিছু দেখা গেল না। শৈলেনবাবু দেখেছিলেন, একটা

কুয়াসার মত বাষ্প যেন ক্রমশ আকার পরিগ্রহ করছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে materialise করবার আগেই উনি চেচিয়ে উঠলেন, তাই সব নষ্ট হয়ে গেল।'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'তবু, কৈলাসবাবুও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিলেন। মনে নেই, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, একে তাঁর হার্ট দুর্বল—; ভাগ্যে শচী ডাক্তার উপস্থিত ছিল, তাই তখনি ইনজেকশন দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। নইলে হয়তো আর একটা ট্র্যাজেডি ঘটে যেত।'

অতঃপর প্রায় পাঁচ মিনিট আমরা সকলে নীরবে বসিয়া রহিলাম। প্রত্যক্ষদশীর কথা, অবিশ্বাস করিবার উপায় নেই। অন্তত দুইটি বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানকে চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী বলিয়া ধরিয়া না লইলে বিশ্বাস করিতে হয়। আবার গল্পটা এতই অপ্রাকৃত যে সহসা মানিয়া লইতেও মন সরে না।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আপনাদের মতে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মাই তাঁর শোবার ঘরের জানোলার কাছে দেখা দিচ্ছেন?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে?

বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের এ বিষয়ে মতামত কি?'

'তাঁর মতামত ঠিক বোঝা যায় না। গয়ায় পিণ্ড দেবার কথা বলেছিলুম, তা কিছুই করলেন না। বিশেষত তারাশঙ্করবাবু তো এসব কথা কানেই তোলেন না-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেন।' বরদাবাবু একটি ক্ষোভপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের একটা কিনারা হলে হয়তো তাঁর আত্মার সদগতি হত। আমি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানি না; তবু মনে হয়, পরলোক যদি থাকে, তবে প্রেতিযোনির পক্ষে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা অস্বাভাবিক নয়।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তা তো নয়ই। প্রেতিযোনির কেবল দেহ নেই, আত্মা তো অটুট আছে। গীতায়-নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি–'

বাধা দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন? তাঁকে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতুম।'

বরদাবাবু ভাবিয়া বলিলেন, 'চেষ্টা করতে পারি। আপনি ডিটেকটিভ শুনলে হয়তো তারাশঙ্করবাবু আপত্তি করবেন না। আজ বার লাইব্রেরিতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব; যদি তিনি রাজী হন, ওবেলা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তাহলে তাই কথা রইল।'

অতঃপরবরদাবাবু উঠি-উঠি করিতেছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আমরা ভূত দেখতে পাই না?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'একদিনেই যে দেখতে পাবেন এমন কথা বলি না; তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লেগে থাকতে পারলে নিশ্চয় দেখবেন। চলুন না, আজই তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি হয়ে আপনাদের কৈলাসবাবুর বাড়ি নিয়ে যাই। কি বলেন ব্যোমকেশবাবু?

'বেশ কথা। ওটা দেখবার আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আপনাদের দেশে এসেছি, একটা নুতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চাই।'

'তাহলে এখন উঠি। দশটা বাজে। ওবেলা পাঁচটা নাগাদ আবার আসব।' বরদাবাবু ও শৈলেনবাবু প্রস্থান করিবার পর শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হল? আশ্চর্য নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার খুনের গল্প আর বরদাবাবুর ভূতের গল্প-দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি আজগুবি বুঝতে পারছি না।'

'আমার খুনের গল্পে আজগুবি কোনখানটা পেলে?' 'ছ'মাসের মধ্যে যে খুনের কিনারা হয় না। তাকে আজগুবি ছাড়া আর কি বলব? বৈকুণ্ঠবাবু খুন হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো? হার্টফেল করে মারা যাননি?

'কি যে বল—; ডাক্তারের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট রয়েছে, গলা টিপে দম বন্ধ করে তাঁকে মারা হয়েছে। গলায় sub-cutaneous abrasions—'

‘অথচ আততায়ীর কোনো চিহ্ন নেই, একটা আঙুলের দাগ পর্যন্ত না। আজগুবি আর কাকে বলে? বরদাবাবুর তো তবু একটা প্রত্যক্ষদৃশ্য ভূত আছে, তোমার তাও নেই।’– ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, ‘অজিত, ওঠো-স্নান করে নেওয়া যাক। ট্রেনে ঘুম হয়নি; দুপুরবেলা দিব্যি একটি নিদ্রা না দিলে শরীর ধাতস্থ হবে না।’

০৩. অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন

অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন। তারাশঙ্করবাবু রাজী হইয়াছেন; যদিও একটি শোকসন্তপ্তা ভদ্রমহিলার উপর এইসব অযথা উৎপাত তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

বরদাবাবুর সঙ্গে দুইজনে বাহির হইলাম। শশাঙ্কবাবু যাইতে পারিলেন না, হঠাৎ কি কারণে উপরওয়ালার নিকট তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে বরদাবাবু জানাইলেন যে, তারাশঙ্করবাবু লোক নেহাৎ মন্দ নয়, তাঁহার মত আইনজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিলও জেলায় আর দ্বিতীয় নাই; কিন্তু মুখ বড় খারাপ। হাকিমরা পর্যন্ত তাঁহার কটু-তিক্ত ভাষাকে ভয় করিয়া চলেন। হয়তো তিনি আমাদের খুব সাদর সংবর্ধনা করিকেন না; কিন্তু তাহা যেন আমরা গায়ে না মাখি।

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ একটু হাসিল। যেখানে কাযোদ্ধার করিতে হইবে সেখানে তাহার গায়ে গণ্ডারের চামড়া-কেহই তাহাকে অপমান করিতে পারে না। সংসর্গগুণে আমার তুকও বেশ পুরু হইয়া আসিতেছিল।

কেল্লার দক্ষিণ দুয়ার পার হইয়া বেলুনবাজার নামক পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। প্রধানত বাঙালী পাড়া, তাহার মধ্যস্থলে তারাশঙ্করবাবুর প্রকাণ্ড ইমারৎ। তারাশঙ্করবাবু যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

তাঁহার বৈঠকখানায় উপনীত হইয়া দেখিলাম তক্তপোশে ফরাস পাতা এবং তাহার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গৃহস্বামী তাম্রকুট সেবন করিতেছেন। শীর্ণ দীঘকৃিতি লোক, দেহে মাংসের বাহুল্য নাই বরং অভাব; কিন্তু মুখের গঠন ও চোখের দৃষ্টি অতিশয় ধারালো। বয়স ষাটের কাছাকাছি; পরিধানে থান ও শুভ্র পিরান। আমাদের আসিতে দেখিয়া তিনি গড়গড়ার নল হাতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'এস বরদা। এঁরাই বুঝি কলকাতার ডিটেকটিভ?

ইহার কণ্ঠস্বর ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু আছে যাহা শ্রোতার মনে অস্বস্তি ও অস্বচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে। সম্ভবত বড় উকিলের ইহা একটা লক্ষণ; বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষী এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া যে রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়ে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হইল না।

বরদাবাবু সঙ্কুচিতভাবে ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন। ব্যোমকেশ বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমি একজন সত্যান্বেষী।'

তারাশঙ্করবাবুর বাম ভ্রূর প্রান্ত ঈষৎ উত্থিত হইল, বলিলেন, 'সত্যান্বেষী? সেটা কি?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'সত্য অন্বেষণ করাই আমার পেশা-আপনার যেমন ওকালতি।'

তারাশঙ্করবাবুর অধরোষ্ঠ শ্লেষ-হাস্যে বক্র হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, 'ও-আজকাল ডিটেকটিভ কথাটার বুঝি আর ফ্যাশন নেই? তা আপনি কি অন্বেষণ করে থাকেন?

‘সত্য।’

‘তা তো আগেই শুনেছি। কোন ধরনের সত্য?’

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, ‘এই ধরুন, বৈকুণ্ঠবাবু আপনার কাছে কত টাকা জমা রেখে গেছেন–এই ধরনের সত্য জানতে পারলেও আপাতত আমার কাজ চলে যাবে।’

নিমেষের মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের সমস্ত চিহ্ন তারাশঙ্করবাবুর মুখ হইতে মুছিয়া গেল। তিনি

‘বৈকুণ্ঠ আমার কাছে টাকা রেখে গেছে, একথা। আপনি জানলেন কি করে?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমি সত্যান্বেষী।’

এক মিনিট কাল তারাশঙ্করবাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; সম্ভ্রম-প্রশংসা মিশ্রিত কণ্ঠে কহিলেন, ‘ভারি আশ্চর্য! এরকম ক্ষমতা আমি আজ পর্যন্ত কারুর দেখিনি। —বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—বোসো বরদা। বলি, ব্যোমকেশবাবুরও কি তোমার মত পোষা ভূত-টুত আছে নাকি?’

আমরা চৌকিতে উপবেশন করিলে তারাশঙ্করবাবু কয়েকবার গড়গড়ার নিলে ঘন ঘন টান দিয়া মুখ তুলিলেন, ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'অবশ্য আন্দাজে ঢ়িল ফেলেছেন, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা পেলেন কোথায়? অনুমান করতে হলেও কিছু মাল-মশলা চাই তো।

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কিছু মাল-মশলা তো ছিল। বৈকুণ্ঠবাবুর মত ধনী ব্যবসায়ী নগদ টাকা কিছু রেখে যাবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অথচ ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা ছিল না। সম্ভবত ব্যাঙ্ক-জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তবে কোথায় টাকা রাখতেন? নিশ্চয় কোনো বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। বৈকুণ্ঠবাবু প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর মেয়েকে আপনি নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন; সুতরাং বুঝতে হবে, আপনিই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসভাজন বন্ধু।'

তারাশঙ্করবাবু বলিলেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। ব্যাঙ্কের ওপর বৈকুণ্ঠের বিশ্বাস ছিল না। তার নগদ টাকা। যা-কিছু সব আমার কাছেই থাকত এবং এখনো আছে। টাকা বড় কম নয়, প্রায় সতের হাজার। কিন্তু এ টাকার কথা আমি প্রকাশ করিনি; তার মৃত্যুর পর কথাটা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু যখন ধরে ফেলেছেন তখন স্বীকার না করে উপায় নেই। তবু আমি চাই, যেন বাইরে কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনারা তিনজন জানলেন; আর কেউ যেন জানতে না পারে। বুঝলে বরদা?'

বরদাবাবু দ্বিধা-প্রতিবিম্বিত মুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কথাটা গোপন রাখবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি?'

তারাশঙ্করবাবু পুনরায় বারকয়েক তামাক টানিয়া বলিলেন, 'আছে। আপনারা ভাবতে পারেন আমি বন্ধুর গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কথাটা চেপে রাখবার অন্য কারণ আছে।' 'সেই কারণটি জানতে পারি না কি? তারাশঙ্করবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন; তারপর অন্দরের দিকের পদাি ঢাকা দরজার প্রতি একবার কাটোক্ষপাত করিয়া খাটো গলায় বলিলেন, 'আপনারা বোধ হয় জানেন না, বৈকুণ্ঠের একটা বকাটে লক্ষ্মীছাড়া জামাই আছে। মেয়েটাকে নেয় না, স্যাকসি পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। উপস্থিত সে কোথায় আছে জানি না, কিন্তু সে যদি কোন গতিকে খবর পায় যে তার স্ত্রীর হাতে অনেক টাকা এসেছে তাহলে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে যাবে। দুদিনে টাকাগুলো উড়িয়ে আবার সরে পড়বে। আমি তা হতে দিতে চাই না–বুঝলেন?'

ব্যোমকেশ ফরাসের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'বুঝেছি।'

তারাশঙ্করবাবু বলিতে লাগিলেন, 'বৈকুণ্ঠের যথাসর্বস্ব তো চোরে নিয়ে গেছে, বাকি আছে কেবল এই হাজার কয়েক টাকা। এখন জামাই বাবাজী এসে যদি এগুলোকে ফুঁকে দিয়ে যান, তাহলে অভাগিনী মেয়েটা দাঁড়াবে কোথায়? সারা জীবন ওর চলবে কি করে? আমি তো আর চিরদিন বেঁচে থাকব না।'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, ‘ঠিক কথা। তাঁকে গোটকয়েক কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বাড়িতেই আছেন তো? যদি অসুবিধা না হয়—’

‘বেশ। তাকে জেরা করে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আপনি যখন চান, এইখানেই তাকে নিয়ে আসছি।’ বলিয়া তারাশঙ্করবাবু অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে আমি চক্ষু এবং ভ্রূর সাহায্যে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলাম-প্রত্যুত্তরে সে ক্ষীণ হাসিল। বরদাবাবুর সম্মুখে খোলাখুলি বাক্যালাপ হয়তো সে পছন্দ করিবে না, তাই স্পষ্টভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—তারাশঙ্করবাবু লোকটি কি রকম?

পাঁচ মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার পশ্চাতে একটি যুবতী নিঃশব্দে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় একটু আধ-ঘোমটা, মুখ দেখিবার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক নাই; পরিধানে অতি সাধারণ সধবার সাজ। চেহারা একেবারে জলার পেত্নী না হইলেও সুশ্রী বলা চলে না। তবু চেহারার সবাপেক্ষা বড় দোষ বোধ করি মুখের পরিপূর্ণ ভাবহীনতা। এমন ভাবলেশশূন্য মুখ চীন-জাপানের বাহিরে দেখা যায় কি না সন্দেহ। মুখাবয়বের এই প্রাণহীনতাই রূপের অভাবকে অধিক স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যতক্ষণ সে আমাদের সম্মুখে রহিল, একবারও তাহার মুখের একটি পেশী কম্পিত হইল না, চক্ষু পলকের জন্য মাটি হইতে উঠিল না, ব্যঞ্জনাহীন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বোমকেশের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া যন্ত্রচালিতের মত পদার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যা হোক, সে আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্যোমকেশ সেই দিকে ফিরিয়া ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল; তারপর সহজ স্বরে প্রশ্ন করিল, 'আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি যে একেবারে নিঃস্ব হননি তা বোধ হয় জানেন?

'হাঁ।'

'তারাশঙ্করবাবু নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন যে আপনার সতের হাজার টাকা তাঁর কাছে জমা আছে?'

'হাঁ।'

ব্যোমকেশ যেন একটু দমিয়া গেল। একটু ভাবিয়া আবার আরম্ভ করিল, 'আপনার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন?'

'আট বছর।'

'এই আট বছরের মধ্যে আপনি তাঁকে দেখেননি?'

'না।'

'তাঁর চিঠিপত্রও পাননি?'

'না।'

'তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন না?'

'না।'

'আপনি পৈতৃক টাকা পেয়েছেন জানাজানি হলে তিনি ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবেন-এ সম্ভাবনা আছে কি?'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর–

'হাঁ।'

'আপনি তাঁর কাছে যেতে চান না?'

'না।'

লক্ষ্য করিলাম তারাশঙ্করবাবু নিগূঢ় হাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার অন্য পথ ধরিল।

'আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

'যশোরে।'

'স্বশুরবাড়িতে কে আছে?'

'কেউ না।'

'শ্বশুর-শাশুড়ি?'

'মারা গেছেন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছিল কোথা থেকে?'

'নবদ্বীপ থেকে।'

নিবদ্বীপে আপনার খুড়তুত জাঠতুত ভায়েরা আছে, তাদের সংসারে গিয়ে থাকেন না কেন?'

উত্তর নাই।

‘তাদের আপনি বিশ্বাস করেন না?’

‘না।’

‘তারাশঙ্করবাবুকেই সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করেন?

‘হাঁ।’

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর আবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল–

‘আপনার বাবার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দেবার প্রস্তাব বরদাবাবু করেছিলেন। রাজী হননি কেন?’

নিরুত্তর।

‘ওসব আপনি বিশ্বাস করেন না?’

তথাপি উত্তর নাই।

'যাক। এখন বলুন দেখি, যে-রাত্রে আপনার বাবা মারা যান, সে-রাত্রে আপনি কোনো শব্দ শুনেছিলেন?'

'না।'

'হীরা জহরত তাঁর শোবার ঘরে থাকত?'

'হাঁ।'

'কোথায় থাকত?

'জানি না।'

'আন্দাজ করতেও পারেন না?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে কোনো লোকের শত্রুতা ছিল?'

'জানি না।'

‘আপনার বাবা আপনার সঙ্গে ব্যবসার কথা কখনো কইতেন না?’

‘না।’

‘রাত্রে আপনার শোবার ব্যবস্থা ছিল নীচের তলায়। কোন ঘরে শুতেন?’

‘বাবার ঘরের নীচের ঘরে।’

‘তাঁর মৃত্যুর রাত্রে আপনার নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হয়নি?’

‘না।’

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।’

অতঃপর তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে আমাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। বিদায়কালে তারাশঙ্করবাবু সদয়কণ্ঠে ব্যোমকেশকে বলিলেন, ‘আমার কথা যে আপনি যাচাই করে নিয়েছেন এতে আমি খুশিই হয়েছি। আপনি হুঁশিয়ার লোক; হয়তো বৈকুণ্ঠের খুনের কিনারা করতে পারবেন। যদি কখনো সাহায্য দরকার হয় আমার কাছে আসবেন। আর মনে রাখবেন, গচ্ছিত টাকার কথা যেন চাউর না হয়। চাউর করলে বাধ্য হয়ে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে।’

রাস্তায় বাহির হইয়া কেল্লার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। দিবালোক তখন মুদিত হইয়া আসিতেছে; পশ্চিম আকাশ সিন্দুর চিহ্নিত আরশির মত ঝকঝকি করিতেছে। তাহার মাঝখানে বাঁকা চাঁদের রেখা-যেন প্রসাধন-রাত রূপসীর হাসির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে!

ব্যোমকেশের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে বুকে ঘাড় গুজিয়া চলিয়াছে। পাঁচ মিনিট নীরবে চলিবার পর আমি তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, তারাশঙ্করবাবুকে কি রকম বুঝলে?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল, 'ভারি বিচক্ষণ লোক।'

০৪. কেল্লায় প্রবেশ করিয়া

কেল্লায় প্রবেশ করিয়া বাঁহাতি যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গিয়াছে, তাহারি শেষ প্রান্তে কৈলাসবাবুর বাড়ি। স্থানটি বেশ নির্জন। অনুচ্চ প্রাচীর-ঘেরা বাগানের চারিদিকে কয়েকটি ঝাউ ও দেবদারু গাছ, মাঝখানে ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি। বৈকুণ্ঠবাবুকে যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল, বাড়িটির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাকে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

বরদাবাবু আমাদের লইয়া একেবারে উপরতলায় কৈলাসবাবুর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ; মধ্যস্থলে একটি লোহার খাট বিরাজ করিতেছে এবং সেই খাটের উপর পিঠে বালিশ দিয়া কৈলাসবাবু বসিয়া আছেন।

একজন ভৃত্য কয়েকটা চেয়ার আনিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ছাদ হইতে ঝুলানো কেরাসিন ল্যাম্পের আলোয় প্রায়ান্ধকার ঘরের ধূসর অবসন্নতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। মুঙ্গেরে তখনো বিদ্যুৎ-বিভার আবির্ভাব হয় নাই।

কৈলাসবাবুর চেহারা দেখিয়া তিনি রুগ্ন এ বিষয়ে সংশয় থাকে না। তাঁহার রং বেশ ফিসার্চ কিন্তু রোগের প্রভাবে মোমের মত একটা অর্ধ-স্বচ্ছ পাণ্ডুরতা মুখের বর্ণকে যেন নিষ্প্রাণ করিয়া দিয়াছে। মুখে সামান্য ছাঁটা দাড়ি আছে, তাহাতে মুখের শীর্ণতা যেন আরো পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টিতে অশান্ত অনুযোগ উকিঝুকি মারিতেছে, কণ্ঠস্বরও দীর্ঘ রোগভোগের ফলে একটা অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

পরিচয় আদান-প্রদান শেষ হইলে আমরা উপবেশন করিলাম; ব্যোমকেশ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঐ একটিমাত্র জানালা-পশ্চিমমুখী; নীচে বাগান। দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে গঙ্গার স্রোত-রেখা দেখা যায়। এদিকে আর লোকালয় নাই, বাগানের পাঁচল পার হইয়াই গঙ্গার চড়া আরম্ভ হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া বলিল, 'জানালাটা মাটি থেকে প্রায় পনের হাত উঁচু। আশ্চর্য বটে।' তারপর ঘরের চারিপাশে কৌতুহলী দৃষ্টি হানিতে হানিতে চেয়ারে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ কৈলাসবাবুর সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হইল; নূতন কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিন্তু দেখিলাম কৈলাসবাবু লোকটি অসাধারণ একগুঁয়ে। ভৌতিক কাণ্ড তিনি অবিশ্বাস করেন না; বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছেন তাহাও তাঁহার কথার ভাবে প্রকাশ পাইল। কিন্তু তবু কোনোক্রমেই এই হানাবাড়ি পরিত্যাগ করিবেন না। ডাক্তার তাঁহার হৃদযন্ত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবাড়ি ত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার সহচরেরাও ভীত হইয়া মিনতি করিতেছে, কিন্তু তিনি রুগ্ন শিশুর মত অহেতুক জিদ ধরিয়া এই বাড়ি কামড়াইয়া পড়িয়া আছেন। কিছুঁতেই এখান হইতে নড়িবেন না।

হঠাৎ কৈলাসবাবু একটা আশ্চর্য কথা বলিয়া আমাদের চমকিত করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খিটখিটে স্বরে বলিলেন, 'সবাই আমাকে এবাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে। আরো বাপু, বাড়ি ছাড়লে কি হবে–আমি যেখানে যাব, সেখানেই যে এই ব্যাপার হবে। এসব

অলৌকিক কাণ্ড কোন ঘটছে তা তো আর কেউ জানে না; সে কেবল আমি জানি। আপনারা ভাবছেন, কোথাকার কোন বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মা এখানে আনাগোনা করছে। মোটেই তা নয়-এর ভেতর অন্য কথা আছে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রকম?

'বৈকুণ্ঠ-ফৈকুণ্ঠ সব বাজে কথা—এ হচ্ছে পিশাচ। আমার গুণধর পুত্রের কীর্তি।'

'সে কি!'

কৈলাসবাবুর মোমের মত গণ্ডে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইল, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে, জমিদারের একমাত্র বংশধর-পিশাচসিদ্ধ হতে চায়! শুনেছেন কখনো? হতভাগাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি, তাই আমার ওপর রিষ। তার একটা মহাপাষণ্ড গুরু জুটেছে, শুনেছি, শ্মশানে বসে বসে মড়ার খুলিতে করে মদ খায়। একদিন আমার ভদ্রাসনে চড়াও হয়েছিল; আমি দরোয়ান দিয়ে চাবকে বার করে দিয়েছিলুম। তাই দু'জনে মিলে ষড় করে আমার পিছনে পিশাচ লেলিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু—'

'কুলাঙ্গার সন্তান–তার মতলবটা বুঝতে পারছেন না? আমার বুকের ব্যামো আছে, পিশাচ দেখে আমি যদি হার্টফেল করে মরি–ব্যস! মাণিক আমার নিষ্কণ্টকে প্রেতসিদ্ধ শুরুকে নিয়ে বিষয় ভোগ করবেন।' কৈলাসবাবু তিক্তকণ্ঠে হাসিলেন; তারপর সহসা জানালার দিকে তাকাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ-ঐ—'

আমরা জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া কৈলাসবাবুর কথা শুনিতেছিলাম, বিদ্যুদ্বেগে জানালার দিকে ফিরিলাম। যাহা দেখিলাম–তাহাতে বুকের রক্ত হিম হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; ঘরের অনুজ্জ্বল কেরাসিন ল্যাম্পের আলোকে দেখিলাম, জানালার কালো ফ্রেমে আটা একটা বীভৎস মুখ। অস্থিসার মুখের বর্ণ পাণ্ডুপীত, অধরোষ্ঠের ফাঁকে কয়েকটা পীতবর্ণ দাঁত বাহির হইয়া আছে; কালিমা-বেষ্টিত চক্ষুকোটর হইতে দুইটা ক্ষুধিত হিংস্র। চোখের পৈশাচিক দৃষ্টি যেন ঘরের অভ্যন্তরটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মুহূর্তের জন্য নিশ্চল পক্ষাহত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ দুই লাফে জানালার সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর মুখ তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

আমিও ছুটিয়া বোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরের অন্ধকারে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মনে হইল যেন দেবদারু গাছের ঘন ছায়ার ভিতর দিয়া একটা শীর্ণ অতি দীর্ঘ মূর্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ দেশলাই জ্বালিয়া জানালার বাহিরে ধরিল। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম নীচে মই বা তজাতীয় আরোহণী কিছুই নাই। এমন কি, মানুষ দাঁড়াইতে পারে এমন কার্ণিশ পর্যন্ত দেয়ালে নাই।

ব্যোমকেশের কাঠি নিঃশেষ হইয়া নিবিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল।

বরদাবাবু বসিয়াছিলেন, উঠেন নাই। এখন ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ‘দেখলেন?’

‘দেখলুম।’

বরদাবাবু গভীরভাবে একটু হাসিলেন, তাঁহার চোখে গোপন বিজয়গর্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি রকম মনে হল?’

কৈলাসবাবু জবাব দিলেন। তিনি বালিশে ঠেস দিয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, হতাশামিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, ‘কি আর মনে হবে–এ পিশাচ। আমাকে না নিয়ে ছাড়বে না। ব্যোমকেশবাবু, আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পিশাচের হাত থেকে কেউ কখনো উদ্ধার পেয়েছে শুনেছেন কি?’ তাঁহার ভয়বিশীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে হইল, সত্যিই ইহার সময় আসন্ন হইয়াছে, দুর্বল হৃদযন্ত্রের উপর এরূপ স্নায়ুবিক ধাক্কা সহ্য করিতে পরিবেন না।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'দেখুন, ভয়টাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু-প্রেত-পিশাচ নয়। আমি বলি, বাড়িটা না হয় ছেড়েই দিন না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আমিও তাই বলি। আমার বিশ্বাস, এ বাড়িতে দোষ লেগেছে-পিশাচ-টিশাচ নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকে–'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পিশাচই হোক আর বৈকুণ্ঠবাবুই হোন—মোট কথা, কৈলাসবাবুর শরীরের যে রকম অবস্থা তাতে হঠাৎ ভয় পাওয়া ওঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অতএব এ বাড়ি ছাড়াই কর্তব্য।'

'আমি বাড়ি ছাড়ব না।' কৈলাসবাবুর মুখে একটা অন্ধ একগুয়েমি দেখা দিলে—'কেন বাড়ি ছাড়ব? কি করেছি। আমি যে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াব? আমার নিজের ছেলে যদি আমার মৃত্যু চায়-বেশ, আমি মরব। পিতৃহত্যার পাপকে যে কুসন্তানের ভয় নেই, তার বাপ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

অভিমান ও জিদের বিরুদ্ধে তর্ক করা বৃথা। রাত্রি হইয়াছিল। আমরা উঠিলাম। পরদিন প্রাতে আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম।

পথে কোনো কথা হইল না। বরদাবাবু দু-একবার কথা বলিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশ তাহা শুনিতে পাইল না। বরদাবাবু আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

দুইতিমধ্যে বাড়ি ফিরিয়াছিলেন, আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করতেই বললেন, কি হে, কি হ'ল?'

ব্যোমকেশ একটা আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া উর্ধ্বমুখে বলিল, 'প্রেতের আবির্ভাব হল।' তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলিল, 'কিন্তু বরদাবাবুর প্রেত এবং কৈলাসবাবুর পিশাচ মিলে ব্যাপারটা ক্রমেই বুড় জটিল করে তুলেছে।'

পরদিন রবিবার ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যোমকেশ শশাঙ্কবাবুকে বলিল, 'চল, কৈলাসবাবুর বাড়িটা ঘুরে আসা যাক।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'আবার ভূত দেখতে চাও নাকি? কিন্তু দিনের বেলা গিয়ে লাভ কি? রাত্রি ছাড়া তো অশরীরীর দর্শন পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু যা অশরীরী নয়–অর্থাৎ বস্তু—তার তো দর্শন পাওয়া যেতে পারে।'

'বেশ, চল।'

সাতটা বাজিতে না বাজিতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। কৈলাসবাবুর বাড়ি তখনো সম্পূর্ণ জাগে নাই। একটা চাকর নিদ্রালুভাবে নীচের বারান্দা ঝাঁট দিতেছে; উপরে গৃহস্বামীর কক্ষে দরজা জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ বলিল, ক্ষতি নেই। বাগানটা ততক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখি এস।'

শিশির ভেজা ঘাসে সমস্ত বাগানটি আস্তীর্ণ। সোনালী রৌদ্রে দেওদারের চুনট-করা পাতা জরির মত ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে শারদ প্রাতের অপূর্ব পরিচ্ছন্নতা। আমরা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বাগানটি পরিসরে বিঘা চারেকের কম হইবে না। কিন্তু ফুলবাগান বলিয়া কিছু নাই। এখানে সেখানে গোটা-কতক দোপাটি ও করবীর ঝাড় নিতান্ত অনাদৃতভাবে ফুল ফুটাইয়া রহিয়াছে। মালী নাই, বোধকরি বৈকুণ্ঠবাবুর আমলেও ছিল না। আগাছার জঙ্গল বৃদ্ধি পাইলে সম্ভবত বাড়ির চাকরেরাই কাটিয়া ফেলিয়া দেয়।

তাহার পরিচয় বাগানের পশ্চিমদিকে এক প্রান্তে পাইলাম। দেয়ালের কোণ ঘোষিয়া আবর্জনা জমা হইয়া আছে। উনানের ছাঁই, কাঠ-কুটা, ছেড়া কাগজ, বাড়ির জঞ্জাল- সমস্তই এইখানে ফেলা হয়। বহুকালের সঞ্চিত জঞ্জাল রৌদ্রে বৃষ্টিতে জমাট বাঁধিয়া স্থানটাকে স্বকীত করিয়া তুলিয়াছে।

এই আবর্জনার গাদার উপর উঠিয়া ব্যোমকেশ অনুসন্ধিৎসুভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। জুতা দিয়া ছাই-মাটি সরাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার একটা পুরানো টিনের কোটা তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া আবার ফেলিয়া দিল। শশাঙ্কবাবু তাহার রকম দেখিয়া বলিলেন, 'কি হে, ছাইগাদার মধ্যে কি খুঁজছ?'

ব্যোমকেশ ছাইগাদা হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল, 'আমাদের প্রাচীন কবি বলেছেন- যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ। তাই, পাইলে পাইতে পার-এটা কি?'

একটা চিড়্ধরা পরিত্যক্ত লণ্ঠনের চিমনি পড়িয়াছিল; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তাহার খোলের ভিতর দেখিতে লাগিল। তারপর সন্তার্পণে তাহার ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া একখণ্ড জীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবত বায়ুতাড়িত হইয়া কাগজের টুকরাটা চিমনির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল; তারপর দীর্ঘকাল সেইখানে রহিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ চিমনি ফেলিয়া দিয়া কাগজখানা নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল। আমিও উৎসুক হইয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কাগজখানা একটা ছাপা ইস্তহারের অর্ধাংশ; তাহাতে কয়েকটা অস্পষ্ট জন্তু জানোয়ারের ছবি রহিয়াছে মনে হইল। জল-বৃষ্টিতে কাগজের রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ছাপার কালিও এমন অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখছি হে? ওতে কি আছে?'

'কিছু না।' ব্যোমকেশ কাগজখানা উল্টাইয়া তারপর চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, হাতের লেখা রয়েছে। দ্যাখ তো পড়তে পার কিনা।' বলিয়া কাগজ আমার হাতে দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলাম। হাতের লেখা যে আছে তাহা প্রথমটা ধরাই যায় না। কালির চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই, কেবল মাঝে মাঝে কলমের আঁচড়ের দাগ দেখিয়া দুএকটা শব্দ অনুমান করা যায়—

বিপদে...... হাতে টাক...
বাবা..... নচেৎ ..... মরীয়া
...তোমার স্বাথী...

ব্যোমকেশকে আমার পাঠ জানাইলাম। সে বলিল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কাগজটা থাক।' বলিয়া ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

আমি বলিলাম, 'লেখক বোধ হয় খুব শিক্ষিত নয়–বানান ভুল করেছে। 'স্বাথী' লিখেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শব্দটা 'স্বাধী নাও হতে পারে।'

শশাঙ্কবাবু ঈষৎ অধীরকণ্ঠে বলিলেন, "চল চল, আস্তাকুড় ঘেঁটে লাভ নেই। এতক্ষণে বোধহয় কৈলাসবাবু উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, ঐ যে তাঁর ভৌতিক জানালা খোলা দেখছি। চল।'

০৪. কৈলাসবাবু মুখ বাড়াইয়া আছেন

বাড়ির নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, জানোলা দিয়া কৈলাসবাবু মুখ বাড়াইয়া আছেন। শীর্ণ ফ্যাকাসে মুখ-প্রাতঃকাল না হইয়া রাত্রি হইলে তাঁহাকে সহসা ঐ জানালার সম্মুখে দেখিয়া প্রেত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কাহারো সংশয় হইত না।

তিনি আমাদের উপরে আহ্বান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার জানালার নীচের মাটির উপর ক্ষিপ্রদৃষ্টি বুলাইয়া লইল। সবুজ ঘাসের পুরু গালিচা বাড়ির দেয়াল পর্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে; তাহার উপর কোনো প্রকার চিহ্ন নাই।

উপরে কৈলাসবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরে চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত। চা যদিও আমাদের একদফা হইয়া গিয়াছিল, তবু দ্বিতীয়বার সেবন করিতে আপত্তি হইল না।

চায়ের সহিত নানাবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল। স্থানীয় জল-হাওয়ার ক্রমিক অধঃপতন , ডাক্তারদের চিকিৎসা-প্রণালীর ক্রমিক ঊর্ধ্বগতি, টোটকা ঔষধের গুণ, মরণ-উচাটন, ভূতের রোজা ইত্যাদি কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়িল না। ব্যোমকেশ তাহার মাঝখানে একবার জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে আপনি জানালা বন্ধ করে শুচ্ছেন তো?’

কৈলাসবাবু বলিলেন, ‘হ্যাঁ—তিনি দেখা দিতে আরম্ভ করা অবধি জানালা দরজা বন্ধ করেই শুতে হচ্ছে-যদিও সেটা ডাক্তারের বারণ। ডাক্তার চান আমি অপব্যাপ্ত বায়ু সেবন করি।-কিন্তু আমার যে হয়েছে উভয় সঙ্কট। কি করি বলুন?’

‘জানালা বন্ধ করে কোন ফল পেয়েছেন কি?’

‘বড় বেশি নয়। তবে দর্শনটা পাওয়া যায় না, এই পর্যন্ত। নিশুতি রাত্রে যখন তিনি আসেন, জানালায় সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে যান-একলা শুতে পারি না; রাত্রে একজন চাকর ঘরের–মেঝেয় বিছানা পেতে শোয়।’

চা সমাপন্যান্তে ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, ‘এইবার আমি ঘরটা ভাল করে দেখব! শশাঙ্ক, কিছু মনে কোরো না; তোমাদের-অর্থাৎ পুলিসের-কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমি কটাক্ষা করছি না; কিন্তু মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যদি তোমাদের কিছু বাদ পড়ে থাকে। তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।’

শশাঙ্কবাবু একটা বাঁকা-সুরে বলিলেন, ‘তা বেশ-নাও। কিন্তু এতদিন পরে যদি বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর কোনো চিহ্ন বার করতে পার, তাহলে বুঝব তুমি যাদুকর।’

ব্যোমকেশ হাসিল, ‘তাই বুঝো। কিন্তু সে যাক। বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর দিন এ ঘরে কোন আসবাবই ছিল না?’

‘বলেছি তো মাটিতে-পাতা বিছানা, জলের ঘাড়া আর পানের বাটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।–হ্যাঁ, একটা তামার কনখুস্কিও পাওয়া গিয়েছিল।’

‘বেশ। আপনারা তাহলে গল্প করুন কৈলাসবাবু, আমি আপনাদের কোন বিঘ্ন করব না। কেবল ঘরময় ঘুরে বেড়াবা মাত্র।’

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কখনো উর্ধ্বমুখে ছাদের দিকে তাকাইয়া, কখনো হেঁট মুখে মেঝের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তাক্লান্ত মুখে নিঃশব্দে ঘুরিতে লাগিল। একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঠ শার্সি প্রভৃতি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল; দরজার হুড়কা ও ছিটাকিন লগাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর আবার পরিক্রমণ শুরু করিল।

কৈলাস ও শশাঙ্কবাবু স-কৌতুহলে তাহার গতিবিধি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন জোর করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। কারণ ব্যোমকেশের মন যতই বহিনিরপেক্ষ হোক, তিন জোড়া কুতুহলী চক্ষু অনুক্ষণ তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলে সে যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, যাহোক একটা কথা আরম্ভ করিয়া দিয়া ইহাদের দুইজনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। তবু, নানা অসংলগ্ন চাচার মধ্যেও আমাদের মন ও চক্ষু তাহার দিকেই পড়িয়া রহিল।

পনেরো মিনিট এইভাবে কাটিল। তারপর শশাঙ্কবাবুর একটা পুলিস-ঘটিত কাহিনী শুনিতে শুনিতে অলক্ষিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশের দিকে নজর ছিল না; হঠাৎ ছোট্ট একটা হাসির শব্দে সচকিতে ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম, ব্যোমকেশ

দক্ষিণ দিকের দেয়ালের খুব কাছে দাঁড়াইয়া দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কি হল আবার! হাসছ যে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাদু। দেখে যাও। এটা নিশ্চয় তোমরা আগে দ্যাখনি।' বলিয়া দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমরা সাগ্রহে উঠিয়া গেলাম। প্রথমটা চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তারপর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মেঝে হইতে আন্দাজ পাঁচ ফুট উচ্চে সাদা। চুনের উপর পরিষ্কার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। যেন কাঁচা চুনের উপর আঙুল টিপিয়া কেহ। চিহ্নটি রাখিয়া গিয়াছে।

শশাঙ্কবাবু ভ্রূকুটি সহকারে চিহ্নটি দেখিয়া বলিলেন, 'একটা বুড়ো-আঙুলের ছাপ দেখছি। এর অর্থ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অর্থ–মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। হত্যাকারীর এই পরিচয় চিহ্নটি তোমরা দেখতে পাওনি।'

বিস্ময়ে ভ্রু তুলিয়া শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'হত্যাকারীর! এ আঙুলের দাগ যে হত্যাকারীর তা তুমি কি করে বুঝলে? আমরা আগে ওটা লক্ষ্য করিনি বটে। কিন্তু তাই বলে ওটা

হত্যাকারীর আঙুলের দাগ যে কেন হবে-তাও তো বুঝতে পারছি না। যে রাজমিস্ত্রি ঘর চুনকাম করেছিল তার হতে পারে; অন্য যে-কোনো লোকের হতে পারে।'

'একেবারে অসম্ভব নয়। তবে কথা হচ্ছে, রাজমিস্ত্রি দেয়ালে নিজের আঙুলের টিপ রেখে যাবে কেন?'

'তা যদি বল, হত্যাকারীই বা রেখে যাবে কেন?'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকাইল; তারপর বলিল, 'তাও তো বটে। তাহলে তোমার মতে ওটা কিছুই নয়?'

'আমি বলতে চাই, ওটা যে খুব জরুরী তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।'

ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার যুক্তি অকাট্য। প্রমাণের অভাবে কোন জিনিসকেই জরুরী বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। —পকেটে ছুরি আছে? কিম্বা কানখুস্কি?'

'ছুরি আছে। কেন?'

অপ্রসন্ন মুখে শশাঙ্কবাবু ছুরি বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের আবিষ্কারে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, তাই বোধ হয় সেটাকে তুচ্ছ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তবু

তাঁহার মনোভাব নেহাৎ অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল না। দেয়ালের গায়ে একটা আঙুলের চিহ্ন-কবে কাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে কিছুই জানা নাই—হত্যাকাণ্ডের রহস্য-সমাধানে ইহার মূল্য কি? এবং যদি উহা হত্যাকারীরই হয় তাহা হইলেই বা লাভ কি হইবে? কে হত্যাকারী তোহই যখন জানা নাই তখন এই আঙুলের টিপ কোন কাজে লাগিবে তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না।

ব্যোমকেশ কিন্তু ছুরি দিয়া চিহ্নটির চারিধারে দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল। অতি সন্তর্পণে চুন-বালি আলগা করিয়া ছুরির নখ দিয়া একটু চাড় দিতেই টিপ-চিহ্ন সমেত খানিকটা প্ল্যাস্টার বাহির হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ সেটি সযত্নে রুমালে জড়াইয়া পকেটে রাখিয়া কৈলাসবাবুকে বলিল–' 'আপনার ঘরের দেয়াল কুশ্রী করে দিলাম। দয়া করে একটু চুন দিয়ে গর্তটা ভরাট করিয়ে নেবেন।' তারপর শশাঙ্কবাবুকে বলিল, 'চল শশাঙ্ক, এখানকার কোজ আপাতত আমাদের শেষ হয়েছে। এদিকে দেখছি নটা বাজে; কৈলাসবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। —ভাল কথা, কৈলাসবাবু, আপনি বাড়ি থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র পান তো?'

কৈলাসবাবু বলিলেন, 'আমাকে চিঠি দেবে কে? একমাত্র ছেলে-তার গুণের কথা তো শুনেছেন; চিঠি দেবার মত আত্মীয় আমার কেউ নেই।'

প্রফুল্লস্বরে ব্যোমকেশ বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। আচ্ছা, আজ তাহলে চললুম; মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব। আর দেখুন, এটার কথা কাউকে বলে দরকার নেই।' বলিয়া দেয়ালের ছিদ্রের দিকে নির্দেশ করিল।

কৈলাসবাবুঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। রৌদ্র তখন কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিলাম।

হঠাৎ শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যোমকেশ, ওই আঙুলের দাগটা সম্বন্ধে তোমার সত্যিকার ধারণা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ধারণা তো বলেছি, ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ।'

অধীরভাবে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কিন্তু এ যে তোমার জবরদস্তি। হত্যাকারী কে তার নামগন্ধও জানা নেই।–অথচ তুমি বলে বসলে ওটা হত্যাকারীর। একটা সঙ্গত কারণ দেখান চাই তো।'

'কি রকম সঙ্গত কারণ তুমি দেখতে চাও?'

শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠের বিরক্তি আর চাপা রহিল না, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কিছুই দেখতে চাই না। আমার মনে হয় তুমি নিছক ছেলেমানুষী করছ। অবশ্য তোমার দোষ নেই; তুমি ভাবিছ বাংলা দেশে যে প্রথায় অনুসন্ধান চলে এদেশেও বুঝি তাই চলবে। সেটা তোমার ভুল। ও ধরনের ডিটেকটিভগিরিতে এখানে কোন কাজ হবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাই, আমার ডিটেকটিভ বিদ্যে কাজে লাগাবার জন্য তো আমি তোমার কাছে আসিনি, বরং ওটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই এসেছি। তুমি যদি মনে কর এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করবার দরকার নেই তাহলে তো আমি নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে যাই।'

শশাঙ্কবাবু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'না, আমি তা বলছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য, ওপথে চললে কস্মিন কালেও কিছু করতে পারবে না–এ ব্যাপার অত সহজ নয়।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'ছ'মাস ধরে আমরা যে-ব্যাপারের একটা হদিস বার করতে পারলুম না, তুমি একটা আঙুলের টিপ দেখেই যদি মনে কর তার সমাধান করে ফেলেছি, তাহলে বুঝতে হবে এ কেসের গুরুত্ব তুমি এখনো ঠিক ধরতে পারেনি। আঙুলের দাগ কিম্বা আস্তাকুড়ে কুড়িয়ে পাওয়া ছেড়া কাগজে দুটো হাতের অক্ষর-এসব দিয়ে লোমহর্ষণ উপন্যাস লেখা চলে, পুলিসের কাজ চলে না। তাই বলছি, ওসব আঙুলের টিপা-ফিপ ছেড়ে—'

'থামো।'

পাশ দিয়া একখানা ফিটন গাড়ি যাইতেছিল, তাহার আরোহী আমাদের দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন; গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ব্যোমকেশবাবু, কদ্দুর?'

তারাশঙ্করবাবু গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছেন; কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, গায়ে নামাবলী্, মুখে একটা ব্যঙ্গ-হাস্য।

ব্যোমকেশ তাঁহার প্রশ্নে ভালমানুষের মত প্রতিপ্রশ্ন করিল—’কিসের?’

‘কিসের আবার—বৈকুণ্ঠের খুনের। কিছু পেলেন?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন? আমার তো কিছু জা িনবার কথা নয়। বরং শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করুন।’

তারাশঙ্করবাবু বাম ভ্রু ঈষৎ তুলিয়া বলিলেন, ‘কিন্তু শুনেছিলুম যেন, আপনিই নূতন করে এ কেসের তদন্ত করবার ভার পেয়েছেন! তা সে যা হোক, শশাঙ্কবাবু, খবর কি? নূতন কিছু আবিষ্কার হল?’

শশাঙ্কবাবু নীরসকণ্ঠে বলিলেন, ‘আবিষ্কার হলেও পুলিসের গোপন কথা সাধারণে প্রকাশ করবার আমার অধিকার নেই। আর, ওটা আপনি ভুল শুনেছেন।–ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, মুঙ্গেরে বেড়াতে এসেছে, তদন্তের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।’

পুলিসের সহিত উকিলের প্রণয় এ জগতে বড়ই দুর্লভ। দেখিলাম, তারাশঙ্করবাবু ও শশাঙ্কবাবুর মধ্যে ভালবাসা নাই। তারাশঙ্করবাবু কণ্ঠস্বরে অনেকখানি মধু ঢালিয়া দিয়া

বলিলেন, 'বেশ বেশ। তাহলে কিছুই পারেননি। আপনাদের দ্বারা যে এর বেশি হবে না তা আগেই আন্দাজ করেছিলুম।–হাঁকো।'

তারাশঙ্করবাবুর ফিটন বাহির হইয়া গেল।

শশাঙ্কবাবু কটমটে চক্ষে সেইদিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে যাহা বলিলেন তাহা প্রিয়সম্ভাষণ নয়। ভিতরে ভিতরে সকলেরই মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। পথে আর কোন কথা হইল না, নীরবে তিনজনে বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

০৬. দুপুরবেলাটা ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল

দুপুরবেলাটা ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। একবার ছেড়া কাগজখানা ও আঙুলের টিপ বাহির করিয়া অবহেলাভরে দেখিল; আবার সরাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার মনের ক্রিয়া ঠিক বুঝিলাম না; কিন্তু বোধ হইল, এই হত্যার ব্যাপারে। এতাবৎকাল সে যেটুকু আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল তাহাও যেন নিবিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন। বলিলেন, ‘এখানে আমাদের বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, চলুন আজ। আপনাদের সেখানে নিয়ে যাই।’

‘চলুন।’

দুইদিন এখানে আসিয়াছি কিন্তু এখনো স্থানীয় দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই দেখি নাই; তাই বরদাবাবু আমাদের কষ্টহারিণীর ঘাট, পীর-শানফার কবর ইত্যাদি কয়েকটা স্থান ঘুরাইয়া দেখাইলেন। তারপর সূর্য্যস্ত হইলে তাঁহাদের ক্লাবে লইয়া চলিলেন।

কেল্লার বাহিরে ক্লাব। পথে যাইতে দেখিলাম-একটা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড তাঁবু। পড়িয়াছে; তাহার চারিদিকে মানুষের ভিড়-তাঁবুর ভিতর হইতে উজ্জ্বল আলো এবং ইংরাজি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওটা কি?'

'একটা সার্কাস পার্টি এসেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে সার্কাস পার্টিও আসে নাকি?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আসে বৈকি। বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার করে নিয়ে যায়। এই তো গত বছর একদল এসেছিল–না, গত বছর নয়, তার আগের বছর।'

'এরা কতদিন হল এসেছে?'

'কাল শনিবার ছিল, কাল থেকে এরা খেলা দেখাতে শুরু করেছে।'

প্রসঙ্গত শহরের আমোদ-প্রমোদের অভাব সম্বন্ধে বরদাবাবু অভিযোগ করিলেন। মুষ্টিমেয় বাঙালীর মধ্যে চিরন্তন দলাদলি, তাই থিয়েটারের একটা সখের দল থাকা সত্ত্বেও অভিনয় বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না; বাহির হইতে এক-আধটা কার্ণিভালের দল যাহা আসে তাঁহাই ভরসা। শুনিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইলাম না। বাঙালীর বাস্তব জীবনে যে জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের অসদ্ভাব, তাহা সে থিয়েটারের রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া মিটাইয়া লইতে চায়। তাই যেখানে দুইজন বাঙালী আছে সেইখানেই থিয়েটার ক্লাব

থাকিতে বাধ্য এবং যেখানে থিয়েটার ক্লাব আছে সেখানে দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমোদ-প্রমোদের জন্য চালানি মালের উপর নির্ভর করিতে হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

শুনিতে শুনিতে ক্লাবে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ক্লাবের প্রবেশপথটি সঙ্কীর্ণ হইলেও ভিতরে বেশ সুপ্রসর। খানিকটা খোলা জায়গার উপর কয়েকখানি ঘর। আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি ঘরে ফরাস পাতা, তাহার উপর বসিয়া কয়েকজন সভ্য ব্রিজ খেলিতেছেন; প্রতি হাত খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিতেছেন, আবার খেলা আরম্ভ হইবামাত্র সকলে গভীর ও স্বল্পবাক হইয়া পড়িতেছেন। ক্রীড়াচক্রের বাহিরে তাঁহাদের চিত্ত কোন অবস্থাতেই সঞ্চারিত হইতেছে না; আমরা দুইজন আগন্তুক আসিলাম তাহা কেহ লক্ষ্যই করিলেন না। ঘরের এক কোণে দুইটি সভ্য দাবার ছক লইয়া তুরীয় সমাধির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং বাজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের কঠোর তপস্যা অপ্সরার ঝাঁক আসিয়াও ভাঙিতে পরিবে না।

পাশের ঘর হইতে কয়েকজন উত্তেজিত সভ্যের গলার আওয়াজ আসিতেছিল, বরদাবাবু আমাদের সেই ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি টেবিল বেষ্টন করিয়া কয়েকজন যুবক বসিয়া আছেন—তন্মধ্যে আমাদের পূর্বপরিচিত শৈলেনবাবুও বর্তমান। তাঁহাকে বাকি সকলে সপ্তরিথীর মত ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভূতযোনি সম্বন্ধে নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ ও সন্দেহমূলক বাক্যজালে বিদ্ধ করিয়া প্রায় ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

বরদাবাবুকে দেখিয়া শৈলেনবাবুর চোখে পরিত্রাণের আশা ফুটিয়া উঠিল, তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আসুন বরদাবাবু, এঁরা আমাকে একেবারে-; এই যে, ব্যোমকেশবাবু, আপনারাও এসেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

নবাগত দুইজনকে দেখিয়া তর্ক বন্ধ হইল। বরদাবাবু আমাদের পরিচয় দিয়া, আমরা উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন? কি হয়েছে?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'ওঁরা আমার ভূত দেখার কথা বিশ্বাস করছেন না, বলছেন ওটা আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত একটা বায়বীয় মূর্তি।'

পৃথ্বীশবাবু নামক একটি ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমরা বলতে চাই, বরদার আষাঢ়ে গল্প শুনে শুনে ওঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে উনি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছেন। বস্তুত যেটাকে উনি ভূত মনে করছেন সেটা হয়তো একটা বাদুড় কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু।'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'আমি স্বীকার করছি যে আমি স্পষ্টভাবে কিছু দেখিনি। তবু বাদুড় যে নয় একথা আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি। আর বরদাবাবুর গল্প শুনে আমি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। এ অপবাদ যদি দেন–'

বরদাবাবু আমাদের দিকে নির্দেশ করিয়া গভীর স্বরে কহিলেন, 'এঁরা দু'জন কাল সকালে এখানে এসেছেন। এঁদেরও আমি গল্প শুনিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি বলে সন্দেহ হয় কি?'

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন, 'না, তা হয় না। তবে সময় পেলে–'

বরদাবাবু বলিলেন, 'ওঁরা কাল রাত্রে দেখেছেন।' সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপর পৃথীশবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্যি দেখেছেন?'

ব্যোমকেশ স্বীকার করিল, 'হ্যাঁ।'

'কি দেখেছেন?'

'একটা মুখ।'

প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিলেন। তখন ব্যোমকেশ যে অবস্থায় ঐ মুখ দেখিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল। শুনিয়া সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। বরদাবাবু ও শৈলেনবাবুর মুখে বিজয়ীর গর্বোল্লাস ফুটিয়া উঠিল।

অমূল্যবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তর্কে যোগ দেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে অনিচ্ছপীড়িত প্রত্যয় এবং অবরুদ্ধ অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যাহা বিশ্বাস করিতে

চাহি না, তাহাই অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বাস করিতে হইলে মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয় তাঁহার মনের অবস্থাও সেইরূপ-কোন প্রকারে এই অনীপ্সিত বিশ্বাসের মূল ছেদন করিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন, বিরুদ্ধতার শ্লেষ কণ্ঠ হইতে যথাসম্ভব অপসারিত করিয়া বলিলেন, 'তা যেন হল, অনেকেই যখন দেখেছেন বলছেন।–তখন না হয়। ঘটনাটা সত্যি বলেই মেনে নেয়া গেল। কিন্তু কেন? বৈকুণ্ঠ জহুরী যদি ভুতই হয়ে থাকে তাহলে কৈলাসবাবুকে বিরক্ত করে তার কি লাভ হচ্ছে? এই কথাটা আমায় কেউ বুঝিয়ে দিতে পার?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'প্রেতযোনির উদ্দেশ্য সব সময় বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয় বৈকুণ্ঠবাবু কিছু বলতে চান।'

অমূল্যবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, 'বলতে চান তো বলছেন না কেন?'

'সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখেই আমরা এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি যে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া, প্রেতাত্মার মূর্তি পরিগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকলেও কথা কইবার ক্ষমতা সর্বত্র থাকে না। একটাপ্লাজম নামক যে-বস্তুটা মূর্তি-গ্রহণের উপাদান–'

'পণ্ডিত্য ফলিও না বরদা। Spiritualism-এর বইগুলো যে ঝাড়া মুখস্থ করে রেখেছি তা আমরা জানি। কিন্তু তোমার বৈকুণ্ঠবাবু যদি কথাই না বলতে পারবেন তবে নিরীহ একটি ভদ্রলোককে নাহিক জ্বালাতন করছেন কেন?'

‘মুখে কথা বলতে না পারলেও তাঁকে কথা বলাবার উপায় আছে।’

‘কি উপায়?’

‘টেবিল চালা।’

‘ও-সেই তেপায়া টেবিল? সে তো জুচ্চুরি।’

‘কি করে জানলে? কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ?’

অমূল্যবাবুকে নীরব হইতে হইল। তখন বরদাবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ‘দেখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৈকুণ্ঠবাবুর কিছু বক্তব্য আছে; হয়তো তিনি হত্যাকারীর নাম বলতে চান। আমাদের উচিত। তাঁকে সাহায্য করা। টেবিল চেলে তাঁকে ডাকলে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। টেবিল চালিয়ে দেখবেন?’

ভূত নামানো কখনও দেখি নাই; ভারি আগ্রহ হইল। বলিলাম, ‘বেশ তো, করুন না। এখনি করবেন?’

বরদবাবু বলিলেন, ‘দোষ কি? এইখানেই করা যাক-কি বল তোমরা? ভূত যদি নামে, তোমাদের সকলেরই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।’

সকলেই সোৎসাহে রাজী হইলেন।

একটি ছোট টিপাই তৎক্ষণাৎ আনানো হইল। বরদাবাবু বলিলেন যে, বেশি লোক থাকিলে চক্র হইবে না, তাই পাঁচজনকে বাছিয়া লওয়া হইল। বরদাবাবু, ব্যোমকেশ, শৈলেনবাবু, অমূল্যবাবুও আমি রহিলাম। বাকি সকলে পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

আলো কমাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজন টিপাইয়ের চারিদিকে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। কি করিতে হইবে বরদাবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন টিপাইয়ের উপর আলগোছে হাত রাখিয়া পরস্পর আঙুলে আঙুল ঠেকাইয়া মুদিত চক্ষে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যান শুরু করিয়া দিলাম। ঘরের মধ্যে আবছায়া অন্ধকার ও অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট এইভাবে কাটিল। ভূতের দেখা নাই। মনে আবোল-তাবোল চিন্তা আসিতে লাগিল; জোর করিয়া মনকে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যানে জুড়িয়া দিতে লাগিলাম। এইরূপ টানাটানিতে বেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল টিপাইটা যেন একটু নড়িল। হঠাৎ দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, আঙুলের স্নায়ুগুলা নিরতিশয় সচেতন হইয়া রহিল।

আবার টিপাই একটু নড়িল, যেন ধীরে ধীরে আমার হাতের নীচে ঘুরিয়া যাইতেছে।

বরদবাবুর গভীর স্বর শুনিলাম-“বৈকুণ্ঠবাবু এসেছেন কি? যদি এসে থাকেন একবার টোকা দিন।’

কিছুক্ষণ কোন সাড়া নাই। তারপর টিপাইয়ের একটা পায়া ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিয়া ঠিক করিয়া মাটিতে পড়িল।

বরদাবাবু গভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, 'আবির্ভাব হয়েছে!'

স্নায়ুর উত্তেজনা আরো বাড়িয়া গেল; কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। চক্ষু মেলিয়া কিন্তু একটা বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করিলাম। কি দেখিব আশা করিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু দেখিলাম যেমন পাঁচজন আধা অন্ধকারে বসিয়াছিলাম। তেমনি বসিয়া আছি, কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইতিমধ্যে যে একটা গুরুতর রকম অবস্থান্তর ঘটিয়াছে'–এই ঘরে আমাদেরই আশেপাশে কোথাও অশরীরী আত্মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে-তোহা বুঝিবার উপায় নাই।

বরদাবাবু নিম্নস্বরে আমাদের বলিলেন, 'আমিই প্রশ্ন করি।–কি বলেন?'

আমরা শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি জানাইলাম। তখন তিনি ধীর গভীরকণ্ঠে প্রেতিযোনিকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন—

'আপনি কি চান?'

কোনো উত্তর নাই। টিপাই অচল হইয়া রহিল।

'আপনি বারবার দেখা দিচ্ছেন কেন?'

মনে হইল টিপাই একটু নড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

'আপনার কিছু বক্তব্য আছে?'

এবার টিপাইয়ের পায়া স্পষ্টত উঠিতে লাগিল। কয়েকবার ঠক ঠক শব্দ হইল-অর্থ কিছু বোধগম্য হইল না।

বরদাবাবু কহিলেন, 'যদি হ্যাঁ বলতে চান একবার টোকা দিন, যদি না বলতে চান দু'বার টোকা দিন।'

একবার টোকা পড়িল।

দেখিলাম, পরলোকের সহিত ভাব বিনিময়ের প্রণালী খুব সরল নয়। 'হ্যাঁ, বা 'না কোনোক্রমে বোঝানো যায়; কিন্তু বিস্তারিতভাবে মনের কথা প্রকাশ করা আশীরীরীর পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু তবু মানুষের বুদ্ধি দ্বারা সে বাধাও কিয়ৎপরিমাণে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে—সংখ্যার দ্বারা অক্ষর বুঝাইবার রীতি আছে। বরদাবাবু সেই রীতি অবলম্বন

করিলেন; প্রেতিযোনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘আপনি যা বলতে চান, অক্ষর গুণে গুণে টোকা দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।’

তখন টেলিগ্রাফে কথা আরম্ভ হইল। টিপাইয়ের পায়া ঠিক করিয়া কয়েকবার নড়ে্, আবার স্তব্ধ হয়; আবার নড়ে-আবার স্তব্ধ হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কথাগুলি অতি কষ্ট্রে বাহির হইয়া আসিল তাহা এই—

বাড়ি—ছেড়ে—যাও—নচেৎ–অমঙ্গল–

টিপাইয়ের শেষ শব্দ থামিয়া যাইবার পর আমরা কিছুক্ষণ ভয়স্তম্ভিতবৎ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরদাবাবু গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, ‘আপনার বাড়ি যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা তার চেষ্টা করব। আর কিছু বলতে চান কি?’

টিপাই স্থির।

আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, বরদাবাবুকে চুপি চুপি বলিলাম, হত্যাকারী কে জিজ্ঞাসা করুন।’

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। খানিকক্ষণ কোন উত্তর আসিল না; তারপর পায়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

তা—রা—তা—রা—তা—রা—

হঠাৎ টিপাই কয়েকবার সজোরে নড়িয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। বরদাবাবু কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'কি বললেন, বুঝতে পারলুম না। 'তারা–কি? কারুর নাম?'

টিপাইয়ে সাড়া নাই।

আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি আছেন?'

কোনো উত্তর আসিল না, টিপাই জড় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

তখন বরদাবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'চলে গেছেন।'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল; তারপর সকলের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নেহাৎ অরসিকের মত বলিল, 'মাফ করবেন, এখন কেউ টিপাই থেকে হাত তুলবেন না। আপনাদের হাত আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

বরদাবাবু ঈষৎ হাসিলেন—'আমরা কেউ হাতে আঠা লাগিয়ে রেখেছি। কিনা দেখতে চান? বেশ-দেখুন।'

ব্যোমকেশের ব্যবহারে আমি বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। এমন খোলাখুলিভাবে এতগুলি ভদ্রলোককে প্রবঞ্চক মনে করা নিতান্তই শিষ্টতা-বিগর্হিত। তাহার মনে একটা প্রবল সংশয় জাগিয়াছে সত্য-কিন্তু তাই বলিয়া এমন কঠোরভাবে সত্য পরীক্ষা করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। সকলেই হয়তো মনে মনে ক্ষুন্ন হইলেন; কিন্তু ব্যোমকেশ নির্লজ্জভাবে প্রত্যেকের হাত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এমন কি আমাকেও বাদ দিল না।

কিন্তু কাহারো হাতেই কিছু পাওয়া গেল না। ব্যোমকেশ তখন দুই করতলে গণ্ড রাখিয়া টিপাইয়ের উপর কনুই স্থাপনপূর্বক শূন্যদৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকাইয়া রহিল।

বরদবাবু খোঁচা দিয়া বলিলেন, 'কিছু পেলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য! এ যেন কল্পনা করাও যায় না।'

বরদাবাবু প্রসন্নস্বরে বলিলেন 'There are more things–'

অমূল্যবাবুর বিরুদ্ধতা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অসংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু–'তারা 'তারা কথার মানে কেউ বুঝতে পারলে?'

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। আমার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল- তারাশঙ্কর। আমি ঐ নামটাই উচ্চারণ করিতে যাইতেছিলাম, ব্যোমকেশ আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'ও আলোচনা না হওয়াই ভাল।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা যা জানতে পেরেছি তা আমাদের মনেই থাক।।* সকলে তাঁহার কথায় গভীর উদ্বিগ্নমুখে সায় দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজকের অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত—এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। বরদাবাবু, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ি ফিরিবার পথে বরদাবাবুর সহিত শৈলেনবাবু এবং অমূল্যবাবু আমাদের সাথী হইলেন। তাঁহাদের বাসা কেল্লার মধ্যে।

আমাদের বাসা নিকটবর্তী হইলে শৈলেনবাবু বলিলেন, 'একলা বাসায় থাকি, আজ রাত্রে দেখছি ভাল ঘুম হবে না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনার আর ভয় কি? ভয় কৈলাসবাবুর।–আচ্ছা, ওঁকে বাড়ি ছাড়াবার কি করা যায় বলুন তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওঁকে ও-বাড়ি ছাড়াতেই হবে। আপনারা তো চেষ্টা করছেনই, আমিও করব। কৈলাসবাবু অবুঝ লোক, তবু ওঁর ভালর জন্যই আমাদের করতে হবে।–কিন্তু বাড়ি পৌঁছে যাওয়া গেছে, আর আপনারা কষ্ট করবেন না! নমস্কার।'

তিনজনে শুভনিশি জ্ঞাপন করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। অমূল্যবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম–শৈলেনবাবু, আপনি বরং আজকের রাতটা আমার বাসাতেই থাকবেন চলুন। আপনিও একলা থাকেন, আমার বাসাতেও উপস্থিত আমি ছাড়া আর কেউ নেই–'

বুঝিলাম টেবিল চালার ব্যাপার সকলের মনের উপরেই আতঙ্কের ছায়া ফেলিয়াছে।

০৭. ব্যোমকেশ সম্বন্ধে হতাশ

শশাঙ্কবাবু বোধহয় মনে মনে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই সেদিন কৈলাসবাবুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে হত্যার প্রসঙ্গ আর ব্যোমকেশের সম্মুখে উত্থাপিত করেন নাই। তাছাড়া হঠাৎ তাঁহার অফিসে কাজের চাপ পড়িয়াছিল, পূজার ছুটির প্রাক্কালে অবকাশেরও অভাব ঘটিয়াছিল।

অতঃপর দুই তিনদিন আমরা শহরে ও শহরের বাহিরে যত্র তত্র পরিভ্রমণ করিয়া কাটাইয়া দিলাম। স্থানটি অতি প্রাচীন, জরাসন্ধের আমল হইতে ক্লাইভের সময় পর্যন্ত বহু কিম্বদন্তী ও ইতিবৃত্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জমা হইয়াছে। পুরাবৃত্তের দিকে যাঁহাদের ঝোঁক আছে তাঁহাদের কাছে স্থানটি পরম লোভনীয়।

এই সব দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ যেন হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। শুধু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সে কৈলাসবাবুর বাসায় গিয়া জুটিত এবং নানাভাবে তাঁহাকে বাড়ি ছাড়িবার জন্য প্ররোচিত করিত। তাহার সুকৌশল বাক্য-বিন্যাসের ফলও ফলিয়ছিল, কৈলাসবাবু নিমরাজী হইয়া আসিয়াছিলেন।

শেষে সপ্তাহখানেক পরে তিনি সম্মত হইয়া গেলেন। কেল্লার বাহিরে একখানা ভাল বাড়ি পাওয়া গিয়াছিল, আগামী রবিবারে তিনি সেখানে উঠিয়া যাইবেন স্থির হইল।

।রবিবার প্রভাতে চা খাইতে খাইতে ব্যোমকেশ বলিল, শশাঙ্ক, এবার আমাদের তলপি তুলতে হবে। অনেকদিন হয়ে গেল।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'এরি মধ্যে! আর দুদিন থেকে যাও না। কলকাতায় তোমার কোনো জরুরী কোজ নেই তো।' তাঁহার কথাগুলি শিষ্টতাসম্মত হইলেও কণ্ঠস্বর নিরুৎসুক হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ উত্তরে বলিল, 'তা হয়তো নেই। কিন্তু তবু কাজের প্রত্যাশায় দোকান সাজিয়ে বসে থাকতে হবে তো।'

'তা বটে। কবে যাবে মনে করছি?'

'আজই। তোমার এখানে ক'দিন ভারি। আনন্দে কাটল–অনেকদিন মনে থাকবে।'

'আজই? তা–তোমাদের যাতে সুবিধা হয়—' শশাঙ্করাবু কিয়ৎকাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর একটু বিরসস্বরে কহিলেন, 'সে ব্যাপারটার কিছুই হল না। জটিল ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই; তবু ভেবেছিলুম, তোমার যে রকম নাম-ডাক হয়তো কিছু করতে পারবে।'

'কোন ব্যাপারের কথা বলছ?'

‘বৈকুণ্ঠবাবর খুনের ব্যাপার। কথাটা ভুলেই গেলে নাকি?’

‘ও-না ভুলিনি। কিন্তু তাতে জানবার কিছু নেই।’

‘কিছু নেই! তার মানে? তুমি সব জেনে ফেলেছি নাকি?’

‘তা-একরকম জেনেছি বৈ কি।’

‘সে কি! তোমার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।’ শশাঙ্কবাবু ঘুরিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, ‘কোন-বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু জানবার ছিল তা তো অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি–তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?’

শশাঙ্কবাবু স্তম্ভিতভাবে তাকাইয়া রহিলেন—‘কিন্তু–অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছ—কি বলছ তুমি? বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী কে তা জানতে পেরেছ?’

‘সে তো গত রবিবারই জানা গেছে।’

‘তবে-তাবে-এতদিন আমায় বলনি কেন?’

ব্যোমকেশ একটু হাসিল–’ভাই, তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল যে পুলিস আমার সাহায্য নিতে চায় না; বাংলাদেশে আমরা যে-প্রথায় কাজ করি সে-প্রথা তোমাদের কাছে একেবারে হাস্যকর, আঙুলের টিপ এবং ছেড়া কাগজের প্রতি তোমাদের অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাই আর আমি উপযাচক হয়ে কিছু বলতে চাইনি। লোমহর্ষণ উপন্যাস মনে করে তোমরা সমস্ত পুলিস-সম্প্রদায় যদি একসঙ্গে অট্টহাস্য শুরু করে দাও—তাহলে আমার পক্ষে সেটা কি রকম সাংঘাতিক হয়ে উঠবে একবার ভেবে দ্যাখো।’

শশাঙ্কবাবু ঢোক গিলিলেন—‘কিন্তু–আমাকে তো ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারতে। আমি তো তোমার বন্ধু! সে যাক, এখন কি জানতে পেরেছ শুনি।’ বলিয়া তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল।

‘কে খুন করেছে? তাকে আমরা চিনি?’

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

তাহার উরুর উপর হাত রাখিয়া প্রায় অনুনয়ের কণ্ঠে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, ‘সত্যি বল ব্যোমকেশ, কে করেছে?’

'ভূত।'

শশাঙ্কবাবু বিমূঢ় হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ঠাট্টা করছ নাকি! ভুতে খুন করেছে?'

'অর্থাৎ-হ্যাঁ, তাই বটে।'

অধীর স্বরে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বল ব্যোমকেশ। যদি তোমার সত্যি সত্যি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে ভুতে খুন করেছে—তাহলে—' তিনি হতাশভাবে হাত উল্টাইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া বারান্দায় একবার পায়চারি করিয়া বলিল, 'সব কথা তোমাকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হলে আজ আমার যাওয়া হয় না।–রাত্রিটা থাকতে হয়। আসামীকে তোমার হাতে সমর্পণ না করে দিলে তুমি বুঝবে না। আজ কৈলাসবাবু বাড়ি বদল করবেন; সুতরাং আশা করা যায় আজ রাত্রেই আসামী ধরা পড়বে।' একটু থামিয়া বলিল, 'আর কিছু নয়, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের জন্যই দুঃখ হয়। —যাক, এখন কি করতে হবে বলি শোনো।'

আশ্বিন মাস, দিন ছোট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছ'টার মধ্যে সন্ধ্যা হয় এবং নয়টা বাজিতে না বাজিতে কেল্লার অধিবাসিবৃন্দ নিদ্রালু হইয়া শয্যা আশ্রয় করে। গত কয়েকদিনেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

সে-রত্রে নটা বাজিবার কিছু পূর্বে আমরা তিনজনে বাহির হইলাম'। ব্যোমকেশ একটা টর্চ সঙ্গে লইল, শশাঙ্কবাবু একজোড়া হাতকড়া পকেটে পুরিয়া লইলেন।

পথ নির্জন; আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া অর্ধচন্দ্রকে ঢাকিয়া দিয়াছে। রাস্তার ধারে বহুদূর ব্যবধানে যে নিষ্প্রভ কেরাসিন-বাতি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় জ্বলিতেছিল তাহা রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে মাত্র। পথে জনমানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

কৈলাসবাবুর পরিত্যক্ত বাসার সম্মুখে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন সরকারী খাজনাখানা হইতে নয়টার ঘণ্টা বাজিতেছে। শশাঙ্কবাবু এদিক ওদিক তাকাইয়া মৃদু শিস দিলেন; অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা লোক বাহির হইয়া আসিল-তাহাকে দেখিতে পাইলাম না , অস্পষ্ট পদশব্দে বুঝিলাম। ব্যোমকেশ তাহাকে চুপি চুপি কি বলিল, সে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমরা সন্তর্পণে বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। শূন্য বাড়ি, দরজা জানোলা সব খোলা—কোথাও একটা আলো জ্বলিতেছে না। প্রাণহীন শবের মত বাড়িখানা যেন নিষ্পন্দ হইয়া আছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। কৈলাসবাবুর ঘরের সম্মুখে ব্যোমকেশ একবার দাঁড়াইল, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া টর্চ জ্বলিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। ঘর শূন্য-খাট বিছানা যাহা ছিল কৈলাসবাবুর সঙ্গে সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। খোলা জানালা-পথে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস নিরাভরণ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

দরজা ভেজাইয়া ব্যোমকেশ টর্চ নিবাইয়া দিল। তারপর মেঝেয় উপবেশন করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, ‘বোসো তোমরা। কতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে কিছু ঠিক নেই, হয়তো রাত্রি তিনটে পর্যন্ত এইভাবে বসে থাকতে হবে। —অজিত, আমি টর্চ জ্বললেই তুমি গিয়ে জানালা আগলে দাঁড়াবে; আর শশাঙ্ক, তুমি পুলিসের কর্তব্য করবে—অর্থাৎ প্রেত্যকে প্রাণপণে চেপে ধরবে।’

অতঃপর অন্ধকারে বসিয়া আমাদের পাহারা আরম্ভ হইল। চুপচাপ তিনজনে বসিয়া আছি , নড়ন-চড়ন নাই; নড়িলে বা একটু শব্দ করিলে ব্যোমকেশ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া যে সময়ের অন্ত্যেষ্টি করিব তাহারও উপায় নাই, গন্ধ পাইলে শিকার ভড়কাইয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া আর এক রাত্রির দীর্ঘ প্রতীক্ষা মনে পড়িল, চোরাবালির ভাঙা কুঁড়ে ঘরে অজানার উদ্দেশ্যে সেই সংশয়পূর্ণ জাগরণ। আজকার রাত্রিও কি তেমনি অভাবনীয় পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে?

খাজনাখানার ঘড়ি দুইবার প্রহর জানাইল—এগারোটা বাজিয়া গেল। তিনি কখন আসিবেন তাহার স্থিরতা নাই; এদিকে চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতেছে।

এই তো কলির সন্ধ্যা-ভাবিতে ভাবিতে একটা অদম্য হাই তুলিবার জন্য হ্যাঁ করিয়াছি, হঠাৎ ব্যোমকেশ সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া আমার উরু চাপিয়া ধরিল। হাই অর্ধপথে হেঁচক লাগিয়া থামিয়া গেল।

জানালার কাছে শব্দ। চোখে কিছুই দেখিলাম না, কেবল একটা অস্পষ্ট অতি লঘু শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়াকে স্পর্শ করিয়া গেল। তারপর আর কোনো সাড়া নাই। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম, বাহিরে কিছুই শুনিতে পাইলাম না-শুধু নিজের বুকের মধ্যে দুন্দুভির মত একটা আওয়াজ ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা আমাদের খুব কাছে, ঘরের মেঝের উপর পা ঘষিয়া চলার মত খসখস শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের দুই হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।–অথচ তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে কি আমাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছে? কে সে? এবার কি করিবে? আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বহিয়া গেল।

প্রভাতের সূর্যরশ্মি যেমন ছিদ্রপথে বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সূক্ষ্ম আলোর রেখা ঘরের মধ্যস্থলে জন্মলাভ করিয়া আমাদের সম্মুখের দেয়াল স্পর্শ করিল। অতি ক্ষীণ আলো কিন্তু তাহাতেই মনে হইল যেন ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম একটা দীঘকৃিতি কালো মূর্তি আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাঁহারই হস্তস্থিত ক্ষুদ্র টর্চের আলো যেন দেয়ালের গায়ে কি অন্বেষণ করিতেছে।

কৃষ্ণ মূর্তিটা ক্রমে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে দেয়ালের সাদা চুনকাম পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার গলা দিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ বাহির হইল, যেন যাহা খুঁজিতেছিল। তাহা সে পাইয়াছে।

এই সময় ব্যোমকেশের হাতের টর্চ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলোকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। তারপর আমি ছুটিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

আগন্তুকও তড়িৎবেগে ফিরিয়া চোখের সম্মুখে হাত তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার মুখখানা প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তারপর মুহুর্তমধ্যে অনেকগুলা ঘটনা প্রায় একসঙ্গে ঘটিয়া গেল। আগন্তুক বাঘের মত আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, শশাঙ্কবাবু তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে জাপটা-জাপটি করিয়া ভূমিসাৎ হইলাম।

ঝুটোপুটি ধস্তাধস্তি কিন্তু থামিল না। শশাঙ্কবাবু, আগন্তুককে কুস্তিগিরের মত মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; আগন্তুক তাঁহার স্কন্ধে সজোরে কামড়াইয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্কবাবু, কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না; তদাবস্থায় টানিতে টানিতে জানালার দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় টর্চের আলোয় তাহার বিকৃত বীভৎস রং-করা মুখখানা দেখিতে পাইলাম। প্রেতাত্মাই বটে।

ব্যোমকেশ শান্ত সহজ সুরে বলিল, 'শৈলেনবাবু, জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাবেন। আপনার রণ-পা ওখানে নেই, তার বদলে জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সদলবলে জানালার নীচে অপেক্ষা করছেন।' তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল, 'জমাদারসাহেব, উপর আইয়ে।'

সেই বিকট মুখ আবার ঘরের দিকে ফিরিল। শৈলেনবাবু! আমাদের নিরীহ শৈলেনবাবু-এই! বিস্ময়ে মনটা যেন অসাড় হইয়া গেল।

শৈলেনবাবুর বিকৃত মুখের পৈশাচিক ক্ষুধিত চক্ষু দুটা ব্যোমকেশের দিকে ক্ষণেক বিস্ফারিত হইয়া রহিল, দাঁতগুলা একবার হিংস্র শ্বাপদের মত বাহির করিলেন, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মুখ দিয়া একটা গোঙানির মত শব্দ বাহির হইল মাত্র। তারপর সহসা শিথিল দেহে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

শশাঙ্কবাবু তাঁহার পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্যোমকেশ বলিল, শশাঙ্ক, শৈলেনবাবুকে তুমি চেনো বটে কিন্তু ওঁর সব পরিচয় বোধহয় জান না। কাঁধ দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি; ও কিছু নয়, টিনচার আয়োডিন লাগালেই সেরে যাবে। তাছাড়া, পুলিসের অধিকার যখন গ্রহণ করেছ তখন তার আনুষঙ্গিক ফলভোগ করতে হবে বই কি। সে যাক, শৈলেনবাবুর আসল পরিচয়টা দিই। উনি হচ্ছেন সার্কাসের একজন নামজাদা জিমনাস্টিক খেলোয়াড় এবং বৈকুণ্ঠবাবুর নিরুদ্দিষ্ট জামাতা। সুতরাং উনি যদি তোমার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েই থাকেন তাহলে তুমি সেটাকে জামাইবাবুর রসিকতা বলে ধরে নিতে পার।'

শশাঙ্কবাবু কিন্তু রসিকতা বলিয়া মনে করিলেন না; গলার মধ্যে একটা নাতি-উচ্চ গর্জন করিয়া জামাইবাবুর প্রকোষ্ঠে হাতকড়া পরাইলেন এবং জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সেই সময়ে তাহার বিরাট গালপাট্টা ও চৌগোঁফা লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

০৮. সতেরো মিনিট রয়েছে মাত্র

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সতেরো মিনিট রয়েছে মাত্র। অতএব চটপট আমার কৈফিয়ৎ দাখিল করে স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করব।'

বাহুল্য। ব্যোমকেশই যে এই অঘটন সম্ভব করিয়াছে তাহাও কি জানি কেমন করিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। শশাঙ্কবাবু প্রীতি ও সন্তোষের ভাব চেষ্টা করিয়াও আর রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাই আমরা আর অযথা বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই মনস্থ করিয়াছিলাম।

কৈলাসবাবু তাঁহার পূর্বতন বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে বিদায়ের পূর্বে আমরা সমবেত হইয়াছিলাম। শশাঙ্কবাবু, বরদাবাবু, অমূল্যবাবু উপস্থিত ছিলেন; কৈলাসবাবু শয্যায় অর্ধশয়ান থাকিয়া মুখে অনভ্যস্ত প্রসন্নতা আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্রের উপর মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তিনি যে অনুতপ্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'এখন বুঝতে পারছি। ভূত নয় পিশাচ নয়—শৈলেনবাবু। উঃ-লোকটা কি ধড়িবাজ! মনে আছে-একবার এই ঘরে বসে 'ঐ-ঐ' করে চেচিয়ে উঠেছিল? আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি। কিছুই দেখেনি-শুধু আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। সে নিজেই যে ভুত এটা যাতে আমরা কোন মতেই না বুঝতে পারি। যা হোক, ব্যোমকেশবাবু, এবার কৈফিয়ৎ পেশ করুন-আপনি বুঝলেন কি করে?

সকলে উৎসুক নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া আরম্ভ করিল, 'বারদাবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, প্রেতিযোনি সম্বন্ধে আমার মনটা গোড়া থেকেই নাস্তিক হয়ে ছিল। ভূত পিশাচ আছে কিনা এ প্রশ্ন আমি তুলছি না; কিন্তু যিনি কৈলাসবাবুকে দেখা দিচ্ছেন তিনি যে ভূত-প্রেত নন-জলজ্যান্ত মানুষ-এ সন্দেহ আমার শুরুতেই হয়েছিল। আমি নেহাৎ বস্তুতান্ত্রিক মানুষ, নিরেট বস্তু নিয়েই আমায় কারবার করতে হয়; তাই অতীন্দ্রিয় জিনিসকে আমি সচরাচর হিসেবের বাইরে রাখি।

'এখন মনে করুন, যদি ঐ ভূতটা সত্যিই মানুষ হয়, তবে সে কে এবং কেন এমন কাজ করছে—এ প্রশ্নটা স্বতঃই মনে আসে। একটা লোক খামক ভুত সেজে বাড়ির লোককে ভয় দেখাচ্ছে কেন? এর একমাত্র উত্তর, সে বাড়ির লোককে বাড়িছাড়া করতে চায়। ভেবে দেখুন, এ ছাড়া আর অন্য কোন সদুত্তর থাকতে পারে না।

'বেশ। এখন প্রশ্ন উঠছে-কেন বাড়িছাড়া করতে চায়? নিশ্চয় তার কোন স্বার্থ আছে। কি সে স্বার্থ?

আপনারা সকলেই জানেন, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যবান হীরা জহরত কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিস সন্দেহ করে যে তিনি একটা কাঠের হাতবাক্সে তাঁর অমূল্য সম্পত্তি রাখতেন এবং তাঁর হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু এটা এত

সহজে বিশ্বাস করতে পারিনি। 'ব্যয়কুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাবুর চরিত্র যতদূর বুঝতে পেরেছি। তাতে মনে হয় তিনি মূল্যবান হীরে-মুক্তো কাঠের বাক্সে ফেলে রাখবার লোক ছিলেন না। কোথায় যে তিনি সেগুলোকে রাখতেন। তাই কেউ জানে না। অথচ এই ঘরেই সেগুলো থাকত।—প্রশ্ন–কোথায় থাকত?

'কিন্তু এ প্রশ্নটা এখন চাপা থাক। এই ভৌতিক উৎপাতের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ এই হতে পারে যে, বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী তাঁর জহরতগুলো নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি, অথচ কোথায় সেগুলো আছে তা সে জানে। তাই সে এ বাড়ির নূতন বাসিন্দাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে; যাতে সে নিরুপদ্রবে। জিনিসগুলো সরাতে পারে।

'সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভুতই বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী। 'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে প্রশ্ন করে আমার দুটো বিষয়ে খটুকী লেগেছিল। প্রথম, তিনি সে-রত্রে কোন শব্দ শুনতে পাননি। এটা আমার অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তিনি এই ঘরের নীচের ঘরেই শুতেন, অথচ তাঁর বাপকে গলা টিপে মারবার সময় যে ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়েছিল তার শব্দ কিছুই শুনতে পাননি। আততায়ী বৈকুণ্ঠবাবুর গলা টিপে কোথায় তিনি হীরে জহরত রাখেন সে-খবর বার করে নিয়েছিল–অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বাক্য-বিনিময় হয়েছিল। হয়তো বৈকুণ্ঠবাবু চীৎকারও করেছিলেন—অথচ তাঁর মেয়ে কিছুই শুনতে পাননি। এ কি সম্ভব?

'দ্বিতীয় কথা, বাপের আত্মার সদগতির জন্য তিনি গয়ায় পিণ্ড দিতে অনিচ্ছুক। আসল কথা তিনি জানেন তাঁর বাপ প্রেতিযোনি প্রাপ্ত হয়নি, তাই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রেতিযোনি যে কে তাও সম্ভবত তিনি জানেন। নচেৎ একজন অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোক জেনেশুনে বাপের পারলৌকিক ক্রিয়া করবে না-এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে সম্বন্ধে অনেকগুলো সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে-সবগুলো তলিয়ে দেখার দরকার নেই। তার মধ্যে প্রধান এই যে, তিনি জানেন কে হত্যা করেছে এবং তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন। স্ত্রীলোকের এমন কে আত্মীয় থাকতে পারে যে বাপের চেয়েও প্রিয়? উত্তর নিষ্প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে যে সুচরিত্রা সে খবর আমি প্রথম দিনই পেয়েছিলুম। সুতরাং স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই যে হত্যাকারী তার আর একটা ইঙ্গিত গোড়াগুড়ি পেয়েছিলুম। প্রেতাত্মাটা পনেরো হাত লম্বা্, দোতলার জানোলা দিয়ে অবলীলাক্রমে উঁকি মারে। সহজ মানুষের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয়? মইও ব্যবহার করে না-মই ঘাড়ে করে অত শীঘ্র অন্তর্ধান সম্ভব নয়। তবে? এর উত্তর-রণ-পা। নাম শুনেছেন নিশ্চয়। দুটো লম্বা লাঠি্, তার ওপর চড়ে সেকালে ডাকাতেরা বিশ-ত্রিশ ক্রোশ দূরে ডাকাতি করে আবার রাতারাতি ফিরে আসত। বর্তমান কালে সার্কাসে রণ-পা চড়ে অনেক খেলোয়াড় খেলা দেখায়। রীতিমত অভ্যাস না থাকলে কেউ রণ-পা চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। কাজেই হত্যাকারী যে সার্কাস-সম্পর্কিত লোক হতে পারে। এ অনুমান নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর বয়াটে জামাই সাকসিন্দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, নিশ্চয় ভাল খেলোয়াড়-সুতরাং অনুমানটা আপনা থেকেই দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'কিন্তু সবাই জানে জামাই দেশে নেই—আট বছর নিরুদ্দেশ। সে হঠাৎ এসে জুটল কোথা থেকে?

'সেদিন এই বাড়ির আঁস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা কাগজের টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। অনেকদিনের জীর্ণ একটা সার্কাসের ইস্তাহার, তাতে আবার সিংহের ছবি তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তার উল্টো পিঠে হাতের অক্ষরে কয়েকটা বাংলা শব্দ লেখা ছিল। মনে হয় যেন কেউ চিঠির কাগজের অভাবে এই ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছে। চিঠির কথাগুলো অসংলগ্ন, তবু তা থেকে একটা অর্থ উদ্ধার করা যায় যে স্বামী অর্থাভাবে পড়ে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইছে। অজিত, তুমি যে শব্দটা 'স্বাধী' পড়েছিলে সেটা প্রকৃতপক্ষে 'স্বামী।

'বোঝা যাচ্ছে, স্বামী সুদূর প্রবাস থেকে অথর্ণভাবে মরীয়া হয়ে স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিল। বলা 'বাহুল্য, অর্থ সাহায্য সে পায়নি। বৈকুণ্ঠবাবু একটা লক্ষ্মীছাড়া পত্নীত্যাগী জামাইকে টাকা দেবেন। একথা বিশ্বাস্য নয়।

এই গেল বছরখানেক আগেকার ঘটনা। দু'বছরের মধ্যে এ শহরে কোনো সার্কাস পার্টি আমেনি; অতএব বুঝতে হবে যে প্রবাস থেকেই স্বামী এই চিঠি লিখেছিলেন এবং তখনো তিনি সাধুর্গসের দলে ছিলেন—সাদা কাগজের অভাবে ইস্তা‌েহারের পিঠে চিঠি লিখেছিলেন।

'কয়েকমাস পরে স্বামী একদা মুঙ্গেরে এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে কোথা থেকে টাকা যোগাড় করেছিলেন জানি না; তিনি এসে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের মত বাস করতে লাগলেন। মুঙ্গেরে কেউ তাঁকে চেনে না।–তাঁর বাড়ি যশোরে আর বিয়ে হয়েছিল নবদ্বীপে।–তাই বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই বলে ধরা পড়বার ভয় তাঁর ছিল না।

'বৈকুণ্ঠবাবু বোধ হয় জামাইয়ের আগমনবোতা শেষ পর্যন্ত জানতেই পারেননি, তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। জামাইটি কিন্তু আড়ালে থেকে শ্বশুর সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে তৈরি হলেন; শ্বশুর যখন স্বেচ্ছায় কিছু দেবেন না। তখন জোর করেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবার সঙ্কল্প করলেন।

'তারপর সেই রাত্রে তিনি রণ-পায়ে চড়ে শ্বশুরবাড়ি গেলেন, জানোলা দিয়ে একেবারে শ্বশুরমশায়ের শোবার ঘরে অবতীর্ণ হলেন। এই আকস্মিক আবিভাবে শ্বশুর বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন, জামাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। কথায় বলে জামাতা দশম গ্রহ। বাবাজী প্রথমে শ্বশুরের গলা টিপে তাঁর হীরা জহরতের গুপ্তস্থান জেনে নিলেন, তারপর তাঁকে নিপাত করে ফেললেন। তিনি বেঁচে থাকলে অনেক ঝঙ্কাট, তাই তাঁকে শেষ করে ফেলবার জন্যেই তৈরি হয়ে এসেছিলেন।

'কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে হীরা জহরতগুলো আত্মসাৎ করবার ফুরসৎ হল না। ইতিমধ্যে নীচে স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, তিনি এসে দোর ঠেলাঠেলি করছিলেন।

'তাড়াতাড়ি জামাইবাবু একটিমাত্র জহরত বার করে নিয়ে সে-রাত্রির মত প্রস্থান করলেন। বাকিগুলো যথাস্থানেই রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু জহরতগুলি রাখতেন বড় অদ্ভুত জায়গায় অর্থাৎ ঘরের দেয়ালে। দেয়ালের চুন-সুরকি খুঁড়ে সামান্য গর্ত করে, তাতেই মণিটা রেখে, আবার চুন দিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতেন। তাঁর পানের বাটায় যথেষ্ট চুন থাকত, কোন হাঙ্গামা ছিল না। বার করবার প্রয়োজন হলে কানখুস্কির সাহায্যে চুন খুঁড়ে বার করে নিতেন।

'জামাইবাবু একটি জহরত দেয়াল থেকে বার করে নিয়ে যাবার আগে গর্তটা তাড়াতাড়ি চুন দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাজ ভাল হয় না, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ চুনের ওপর আঁকা রয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর মণি-মুক্তা কোথায় রাখেন, এ প্রশ্নটা প্রথমে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর সেদিন এঘরে পায়চারি করতে করতে যখন ঐ আঙুলের টিপ চোখে পড়ল, তখন এক মুহূর্তে সমস্ত বুঝতে পারলুম। এই ঘরের দেয়ালে যত্রতত্র চুনের প্রলেপের আড়ালে আড়াই লক্ষ টাকার জহরত লুকোনো কাছে। এমনভাবে লুকোনো আছে যে খুব ভাল করে দেয়ালে পরীক্ষা না করলে কেউ ধরতে পারবে না। শশাঙ্ক, তোমাকে মেহনৎ করে এই পঞ্চাশটি জহরত বার করতে হবে। আমার আর সময় নেই, নইলে আমিই বার করে দিতুম। তবু পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে ঢারা দিয়ে রেখেছি, তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

'যাক। তাহলে আমরা জানতে পারলুম যে, জামাই বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে একটা জহরত নিয়ে গেছে। এবং অন্যগুলো হস্তগত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জামাই লোকটা কে? নিশ্চয় সে এই শহরেই থাকে এবং সম্ভবত আমাদের পরিচিত। তার আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি বটে। কিন্তু কেবলমাত্র আঙুলের ছাপ দেখে শহরসুদ্ধ লোকের ভিতর থেকে একজনকে খুঁজে বার করা যায় না। তবে উপায়?

'সেদিন প্ল্যাঞ্চেট টেবিলে সুযোগ পেলুম। টেবিলে ভূতের আবির্ভাব হল। আমি বুঝলুম আমাদেরই মধ্যে একজন টেবিল নাড়ছেন এবং তিনি হত্যাকারী; ভূতের কথাগুলোই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। একটু ছুতো করে আমি আপনাদের সকলের হতে পরীক্ষা করে দেখলুম। শৈলেনবাবুর সঙ্গে আঙুলের দাগ মিলে গেল ।

'সুতরাং শৈলেনবন্ধুই যে হত্যাকারী তাতে আর সন্দেহ রইল না । আপনাদেরও বোধহয় আর সন্দেহ নেই। বরদাবাবুর শিষ্য হয়ে শৈলেনবাবুর কাজ হাসিল করবার খুব সুবিধা হয়েছিল। লোকটি বাইরে বেশ নিরীহ আর মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাঘের মত ক্রুর আর নিষ্ঠুর। দয়া মায়ার স্থান ওর হৃদয়ে নেই।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। সকলে কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন । তারপর অমূল্যবাবু প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আঃ—বাঁচলুম। ব্যোমকেশবাবু, আর কিছু না হোক বরদার ভূতের হাত থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। যে রকম করে তুলেছিল–আর একটু হলে আমিও ভুতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম আর কি; আপনি বরদার ভূতের রোজা, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

সকলে হাসিলেন। বরদাবাবু বিড়বিড় করিয়া গলার মধ্যে কি বুলিলেন; শুনিয়া অমূল্যবাবু বলিলেন, 'ওটা কি বললে ? সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছ মনে হল।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতির মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই একথা সিদ্ধ হয় না।'

অমূল্যবাবু বলিলেন, 'গজের মাথায় কি আছে কখনো তল্লাস করিনি, কিন্তু তোমার মাথায় যা আছে শুধু আমরা সবাই জানি ।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সতেরো মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এবার তাহলে উঠলুম–নমস্কার । তারাশঙ্করবাবুর কাছে আগেই বিদায় নিয়ে এসেছি।–মহাপ্রাণ লোক । তাঁকে আব্বার আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাবেন; এস অজিত।'